আলবেয়ার কামু-র

দ্য প্লেগ

রূপান্তর: বাবুল আলম

সেবা প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করবেন। লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার কোন ক্ষতি হোক, তা আমরা চাই না।

বাংলাপিডিএফ.নেট

দুটি কথা

বহু সমালোচকের মতেই 'দ্য প্লেগ' আলবেয়ার কামুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসের জন্য ১৯৪৭ সালে তিনি প্রি দেস ক্রিটিকে পুরস্কার লাভ করেন। 'দ্য প্লেগ' মূলত প্রতীকী উপন্যাস। এ প্রতীক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে নাৎসি আগ্রাসান। কামু ওই যুদ্ধে স্বাধীনতার স্বপক্ষে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিলেন। দুটি কাহিনী কখনও সমান্তরালভাবে, আবার কখনও-বা মিলেমিশে এ উপন্যাসে এগিয়েছে। একটিতে বর্ণিত হয়েছে প্লেগ-কবলিত ওরাওঁ-বাসীদের ভয়-ভীতি, সঙ্কট ও দ্বন্দ্বের কথা, অন্যটিতে ডাক্তার বার্নাড রিও-র অসম সাহসী সংগ্রামের। 'দ্য প্লেগ' দুরূহজটিল বৃহৎ উপন্যাস। পাঠকদের পকেট সাশ্রয় এবং প্রকাশনা ব্যয় সংকোচনের স্বার্থে, মূলভাব অক্ষুণ্ন রেখেই, উপন্যাসটি কিঞ্চিৎ সংক্ষেপিত করা হয়েছে। পাঠকবর্গ বিশ্বমানের এ উপন্যাসটির রসাস্বাদনে সক্ষম হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

অনুবাদক

লেখক পরিচিত

আলবেয়ার কামু ১৯১৩ সালে আলজেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জীবন কাটে উত্তর আফ্রিকায়। সেখানে পেশা হিসেবে অনেক ধরনের কাজ করেন তিনি। তার একটি হচ্ছে, আলজেরীয় ফুটবলদলের পক্ষে খেলা। এরপর তিনি চলে আসেন ফ্রান্সে, এবং শুরু করেন সাংবাদিকতা। জার্মান হামলার সময় কামু সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। এ-সময়, তিনি একটি গোপন পত্রিকা–'কম্বাট'–সম্পদনা করেন। এরপর, রাজনীতি এবং সাংবাদিকতা ছেড়ে পুরোপুরিভাবে লেখায় মন দেন কামু। ১৯৫৮ সালে তাঁকে সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন যশস্বী এই ঔপন্যাসিক।

প্রথম পর্ব

এক

আলজেরিয়ার উপকূলে ওরাওঁ শহর। একটা বড় ফরাসি বন্দর। জেলা সদর। ১৯৪-সালে এখানেই ঘটে ঘটনাটি।

ওরাওঁকে দেখলে মনে হয় অদ্ভুত এক চেহারার ভূখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শহরটা। উপসাগরের মুখ থেকে ওপরে উঠে গেছে বিস্তৃত উন্মুক্ত মালভূমি। চারদিকে ঝকঝকে পাহাড়। তারই মাঝখানে ওরাওঁ। সমুদ্রের দিকে পিঠ ফেরানো, তাই শহর থেকে সমুদ্র চোখে পড়ে না।

ওরাওঁ-এ শীত আর গ্রীষ্ম দুটোই প্রচণ্ড। প্রকৃতিও অত্যন্ত নির্মম আর প্রতিকূল। রাত নামে হঠাৎ করে। সৌন্দর্য বলতে কিছুই নেই শহরে। গাছে লতা নেই। পাতায় নেই মর্মর। কবুতর চোখে পড়ে না। শোনা যায় না পাখির ডানার ঝটপটানি। জিনিসপত্তরের অভাব লেগেই আছে। আর আছে মানুষের মনে অভাববোধ। এখানে কখন যে ঋতু বদল হয়, বুঝতে হলে তাকিয়ে দেখতে হয় আকাশের চেহারা। বসন্ত আসার আগে দুটো ঘটনা ঘটে। শরীরে লাগে মৃদু বাতাসের ছোঁয়া, আর শতরতলি থেকে ফেরিঅলারা ঝুড়ি ভরে ফুল নিয়ে আসে শহরে। গরমের দিনে, সূর্যের প্রখর তাপে জ্বলে পুড়ে হাড়ের মত ঠনঠনে হয়ে ওঠে বাড়িঘর। ধূসর ধুলোর আস্তর জমে

দেয়ালে দেয়ালে। শরৎকালে চারদিকে থিকথিক করে কাদা। কেবল শীতে, আবহাওয়াটা সত্যি সত্যি মনোরম হয়ে ওঠে।

অন্যান্য শহরে যা হয়, এখানেও মানুষ কাজকর্ম করে, প্রেম করে, মারা যায়। এবং এসব তারা করে প্রায় একই ঢঙে। সবকিছুর মধ্যে থাকে কেমন একটা তড়িঘড়ি আর নির্লিপ্ত ভাব।

জীবন এখানে ভীষণ একঘেয়ে, অবসাদময়। সবাই শুধু অভ্যাস চর্চা করে। মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে কেবলমাত্র বড়লোক হওয়ার জন্যে। এখানে জীবনের প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্য।

এখানে মানুষ আনন্দ উপভোগ করে খুব সহজ উপায়ে–প্রেমলীলায়, সমুদ্র স্নানে, সিনেমা দেখে। তবে সেগুলো ওরা বরাদ্দ রাখে শনিবার বিকেল এবং রোববারের জন্যে। বাকি দিনগুলোয় শুধু টাকা উপার্জন। সন্ধের পর অফিস থেকে বেরিয়ে কেউ কাফেতে বসে, কেউ পায়চারি করে, কেউ-বা হাওয়া খায় ব্যালকনিতে বসে।

ওরাওঁ একটা আধুনিক শহর। প্রেমলীলা বলতে এখানে যা বোঝায়, নারী এবং পুরুষ খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরকে নিঃশেষ করে ফেলে। আর নয়তো থিতিয়ে থাকে নিরুত্তেজ দাম্পত্য জীবনে। অবকাশ এবং চিন্তাশক্তির অভাবে সত্যিকার প্রেমের উপলব্ধি ছাড়াই নারী পুরুষ পরস্পরকে ভালবাসে। যুবক-যুবতীদের আবেগ যেমন তীব্র তেমনি ক্ষণস্থায়ী।

মৃত্যুর সময় মানুষকে এখানে ভীষণ কষ্ট পেতে হয়। তাপে ঝলসানো দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে মুমূর্ষু মানুষ মৃত্যুর দিন গোনে। অসুস্থ হলেই মানুষ এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সবকিছু থেকে।

দুই

এপ্রিল ১৬। সকাল। নিজের অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসছে ডাক্তার রিও, হঠাৎ সিঁড়িতে, কী যেন নরম মত একটা পায়ে ঠেকল তার। পা সরিয়ে দেখে, একটা ইঁদুর পড়ে রয়েছে। কোনকিছু চিন্তা ভাবনা না করে, যেমন নামছিল তেমনি নেমে গেল ডাক্তার। একেবারে নিচে এসে খেয়াল হলো, আরে ইঁদুরটা ওখানে এল কী করে? দারোয়ান মিশেলকে ও বলল, 'এক্ষুণি ওটাকে সরিয়ে ফেলো।'

খবরটা মিশেল-এর কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো। ও জোর দিয়ে বলল, 'না, না। ইঁদুর আসবে কোত্থেকে।'

রিও বলল, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। সম্ভবত মরা।'

বিশ্বাস এতটুকু টলল না মিশেল-এর। 'ঘরের ভেতর কোথাও তো আমি ইঁদুর দেখিনি। তাহলে বাইরে থেকে কেউ নিয়ে এসেছে। হবে কোন বখাটে ছোকরার কাজ।'

সেদিনই সন্ধ্যার পর, নিজের ফ্ল্যাটে ওঠার পথে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাবি হাতড়াচ্ছে রিও, এমন সময় দেখল প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর তেড়ে আসছে ওর দিকে। টলমল করছিল ইঁদুরটা। শীরর সম্পূর্ণ ভেজা। মাঝপথে থামল ওটা। সামলে নিল নিজেকে। এগিয়ে এল কয়েক পা। আবার থামল। তারপর কিচ্‌কিচ্‌ করতে করতে পড়ে গেল

মেঝের ওপর। ফাঁক হয়ে গেল ইঁদুরটার মুখ, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

দ্রুত ওপরে উঠে এল রিও। ইঁদুরের রক্ত দেখে স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। এক বছর ধরে অসুস্থ ওর স্ত্রী। কাল এক পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে যাবে। ঘরে ঢুকে রিও দেখল স্ত্রী শুয়ে।

ওকে দেখে হাসি ফুটল মহিলার। 'জানো, আজ বেশ ভাল লাগছে।'

'একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। কাল সকাল এগারোটায় নার্স আসবে। তোমরা দুপুরের ট্রেনে যাচ্ছ,' রিওর কথাগুলো উপদেশের মত শোনাল। স্ত্রীর ভেজা কাপালে ঠোঁট বুলাল ও। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন। এপ্রিল ১৭। সকাল আটটা। কাজে যাচ্ছিল রিও। দারোয়ান মিশেল ওর কোটে ফুল গুঁজে দিয়ে জানাল, 'দুষ্টু ছোকরারা আরও তিনটা ইঁদুর ফেলে রেখে গেছে। তবে যাবে কোথায়, পাকড়াও করবই বাছাধনদের।'

কথাটা শুনে একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল রিও। গাড়িতে উঠে শহরতলির দিকে চলল সে। এদিকের রাস্তাগুলো নোংরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাস্টবিনগুলো দেখতে লাগল সে। এক রাস্তাতেই, কয়েকটা ডাস্টবিনে, ডজন খানেক মরা ইঁদুর চোখে পড়ল ওর।

প্রথমে হাঁপানি রোগীর বাসায় গেল ও। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, জাতিতে স্প্যানিশ। বিছানায় বসেছিল বৃদ্ধ। ঘাড়টা পেছন দিকে ফেরানো। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। ঘন ঘন হাঁচি দিচ্ছে। সামনে দুটো পাত্রে শুকনো মটরদানা। রিও ঘরে ঢোকার পর বৃদ্ধের স্ত্রীও ঢুকল। হাতে পানির গ্লাস।

ইনজেকশন দেয়া হতেই, হাঁপানির রোগী ভদ্রলোক বলল, 'শুনেছেন, বেরিয়ে আসছে ওগুলো। আপনি দেখেছেন?'

রিওকে ভদ্রলোকের স্ত্রী বুঝিয়ে বলল, 'ইঁদুরের কথা বলছে। আমাদের পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তাঁর দরজার সামনে তিনটাকে দেখেছে। মরা।'

'আচ্ছা। মনে হয় খিদের জ্বালায় বেরিয়ে আসছে,' জবাব দিল রিও।

রোগীদের বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে রিও বুঝতে পারল, ইঁদুর মরা নিয়ে এই এলাকায় রীতিমত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এল সে।

নিচে দেখা হলো মিশেল-এর সঙ্গে। ও বলল, 'আপনার একটা টেলিগ্রাম এসেছে। ঘরে রেখে এসেছি।'

রিও জানতে চাইল, 'আরও মরা ইঁদুর দেখেছ?'

'না,' জানাল মিশেল।

টেলিগ্রাম এসেছে মা-র কাছ থেকে। জানিয়েছেন পরের দিন আসছেন। রি-ওর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তিনিই ওর দেখাশোনা করবেন।

নার্স এসে গেছে। স্ত্রীর পরনে নতুন পোশাক। কিছু প্রসাধনও মেখেছে ও। 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল রিও।

কয়েক মিনিট পর। ট্রেনের কামরায় স্ত্রীকে তুলে দিল রিও। ওর স্ত্রী বলল, 'ইঁদুর মরা নিয়ে কি হয়েছে বলো তো?'

'এখনও ঠিক বুঝছি না। তুমি সুস্থ হয়ে ফিরে এসো। দেখবে নতুন জীবন শুরু হয়েছে।'

হিসহিস করে উঠল ট্রেনের এঞ্জিন। স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকল রিও। মুখ ফেরাল মহিলা। তখন অশ্রু ঝরছে ওর চোখ দিয়ে। 'এ কী, কাঁদছ তুমি? ভেবো না, লক্ষ্মীটি। দেখবে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছ। গাড়ি ছাড়ার সময় হলো। চলি।' স্ত্রীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ও,

তারপর পিছিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল আবার। এখন কেবল জানালায় ওর হাসিমুখ দেখতে পাচ্ছিল রিও।

'শরীরের যত্ন নিও,' স্ত্রীকে বলল সে। কিন্তু ওর কথা মহিলা শুনতে পেল না।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার পর খুব দ্রুত প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রিও, গেটে দেখা হয়ে গেল পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট মশিয়ে অথন-এর সঙ্গে।

'শুনছি, আজকাল ইঁদুর...,' বলতে বলতে থেমে গেলেন অথন।

'কী যেন বলছিলেন আপনি?' প্রশ্ন করল রিও।

'না। তেমন কিছু নয়।'

সেই মুহূর্তে রিও দেখল, রেলের এক কর্মচারী কাঠের একটা বাক্স নিয়ে যাচ্ছে। মরা ইঁদুর ভর্তি।

সেদিনই বিকেলে, রিও সবে রোগী দেখতে শুরু করেছে, ওর সঙ্গে দেখা করতে এল অপরিচিত এক যুবক। একজন পেশাদার সাংবাদিক। নাম র‍্যাবেয়া। মোটা। বেঁটে। পেশীবহুল চওড়া কাঁধ। মুখে দৃঢ়তার ছাপ। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পরনে খেলোয়াড়দের মত হালকা ফিটফাট পোশাক। প্যারিসের এক দৈনিক কাগজের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে। উদ্দেশ্য, এখানে বসবাসকারী সাধারণ আরবদের জীবনযাত্রা স্বচোখে দেখা।

রিও বলল, 'ওদের জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়।' এরপর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, সত্যি কথা প্রকাশের স্বাধীনতা আপনার আছে?'

'খুব বেশি না,' স্বীকার করল র‍্যাবেয়া।

'তাহলে আর কিছু লেখার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আপনার রিপোর্টের জন্যে তথ্য দিতে আমার আপত্তি আছে।'

হাসল র‍্যাবেয়া। 'আপনি তো দেখছি একজন পয়গম্বর।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কখনোই অন্যায়ের সংস্পর্শে যাব না বা কোন অবস্থাতেই সত্যের অপলাপ করব না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল র‍্যাবেয়া। 'ধন্যবাদ। আপনার মনোভাব বুঝতে পেরেছি।'

রিও দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে। 'আপনি বুঝতে পেরেছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। শহরে খুব বেশি সংখ্যায় ইঁদুর মারা যাচ্ছে। এটার ওপর লিখতে পারেন। নতুনত্ব আছে।'

'তাই?' বিস্ময় প্রকাশ করল র‍্যাবেয়া।

বিকেল পাঁচটা। নিচে নামছিল রিও। শহরতলিতে রোগী দেখতে যাবে। সিঁড়িতে দেখা হলো অল্পবয়স্ক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বলিষ্ঠ শরীর। বিশাল মুখ। রোমশ ভ্রূ, কোঁচকানো। নাম জাঁ তারিউ। সিঁড়িতে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে একটা ইঁদুর, সেদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে তারিউ। রিওকে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে ও বলল, 'ইঁদুরগুলো দলে দলে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মরছে।'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন,' সায় দিল রিও।

কপালে পড়ে থাকা চুলগুলোকে উল্টিয়ে বার কয়েক আঙুল চালাল তারিউ। বারবার ইঁদুরটার দিকে তাকাচ্ছে ও। ততক্ষণে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে ওটার। রিও-র দিকে তাকিয়ে হাসল জাঁ। বলল, 'এ নিয়ে অবশ্য দারোয়ানেরই মাথাব্যথা হওয়া উচিত।'

সিঁড়ির মাথায় মিশেল-এর সঙ্গে দেখা হলো রি-ওর। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। লালচে চেহারাটা কেমন শুকনো, মলিন।

রিও বলল, 'মিশেল, সিঁড়িতে একটা ইঁদুর মরে পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ। জানি,' বলে চলল মিশেল, 'মাঝে মাঝে দু'তিনটিকেও একসঙ্গে মরতে দেখছি। সব বাড়িতেই এক অবস্থা।' হঠাৎ ওকে

মনে হলো উদ্বিগ্ন, হতাশ। অন্যমনস্কভাবে গলা চুলকাল ও।

'মিশেল, তোমার শরীর ভাল তো?' জানতে চাইল রিও।

'অসুখ-বিসুখ হয়তো করেনি, তবে শরীরটা ভাল লাগছে না। বোধহয়, মরা ইঁদুর দেখতে দেখতে আমার মনের ওপর চাপ পড়েছে।'

পরের দিন। এপ্রিল ১৮। সকাল। স্টেশন থেকে মাকে নিয়ে ফিরল রিও। মিশেলকে দেখে ওর মনে হলো লোকটা আগের চেয়ে অসুস্থ, মনমরা। এ সময় ওর চোখে পড়ল, সিঁড়ির নিচ থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মরা ইঁদুর। আসার সময় রাস্তার ডাস্টবিনগুলোতেও একই দৃশ্য দেখেছে ও।

বাড়িতে ঢুকেই মিউনিসিপ্যাল অফিসে টেলিফোন করল রিও। কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার দফতরটির কর্মকর্তার সঙ্গে আগের থেকেই পরিচয় আছে ওর। রিও জানতে চাইল, 'ইঁদুর মরার খবর আপনি জানেন?'

ভদ্রলোক বলল, 'হ্যাঁ। জানি। বন্দরের কাছে পঞ্চাশটার মত মরা ইঁদুর দেখা গেছে। আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছি।' এরপর সে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কি আশঙ্কাজনক?'

'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।'

'আপনি যদি তাই মনে করেন তাহলে আমি কর্তৃপক্ষকে বলে একটা নির্দেশ জারি করার ব্যবস্থা নিতে পারি।'

'এক্ষুণি করিয়ে নিন,' জোর দিয়ে বলল রিও।

কিছুক্ষণ পর ওর বাসার ঝি খবর দিল, ওর স্বামী যে কারখানায় কাজ করে সেখানে কয়েকশো ইঁদুর মরতে দেখা গেছে।

১৮ এপ্রিলের পর থেকে শহরে আরম্ভ হলো উদ্বেগ। রোজ মানুষের চোখে পড়তে লাগল কলকারখানা আর গুদামে মরে পড়ে

আছে অসংখ্য ইঁদুর, আর নয়তো মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকছে।

রোগী দেখার জন্যে রিওকে ঘুরতে হয় শহরতলিতে, উপকণ্ঠে, কেন্দ্রস্থলে, অপরিচিত অলিগলি আর বড় রাস্তায়। সব জায়গায় মরা ইঁদুর দেখতে পেল সে। অগণিত মরা ইঁদুর। কোথাও নর্দমায়, কোথাও-বা ডাস্টবিনে।

জরুরী সভা ডাকলেন পৌর কর্তৃপক্ষ। নির্দেশ দেয়া হলো জনস্বাস্থ্য বিভাগকে: 'প্রতিদিন সকালে, শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মরা ইঁদুর কুড়িয়ে একখানে জড়ো করতে হবে। সেখান থেকে দুটো ভ্যান ওগুলোকে নিয়ে যাবে শহরের শেষ সীমানায়। ওখানে পোড়ানো হবে মরা ইঁদুগুলোকে।'

কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। বেড়ে চলল রাস্তায় পড়ে থাকা মরা ইঁদুরের সংখ্যা। আর সেই সাথে বেড়ে চলল ভ্যান দুটোর বোঝা। তিনদিন পর, বাড়ির ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ইঁদুর। বাইরের আলোয় এসে প্রকাশ্যে মরতে লাগল ওরা। তবু, শেষ হলো না ওদের বংশ। তারপরের দিন, সিঁড়িকোঠা, মাটির নিচে ভাঁড়ার ঘর, নর্দমা সব জায়গা থেকে সারিবদ্ধভাবে আলোয় বেরিয়ে এল ইঁদুরের পাল। প্রচণ্ড বেগে দুলছে ওদের শরীর। কেমন একটা অসহায় অবস্থা। এরপর হঠাৎ লেজের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সবাই। কিন্তু তা আর পারল না। এর আগেই কাত হয়ে পড়ে মরে গেল।

রাতের বেলায়, বাড়ির দরজা, অলিগলি সবখান থেকে ভেসে এল মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর কিচমিচ শব্দ। সকালে দেখা গেল, নর্দমা ভরে আছে সারি সারি মরা ইঁদুরে। প্রত্যেকটির মুখ সরু। আর এর চারপাশে তাজা লাল রক্তের ছোপ, মনে হয় যেন লাল একটা ফুল। কোনটাতে পচন ধরেছে, ফুলে উঠেছে শরীর; কোনটা সিটকে শক্ত হয়ে আছে, কিন্তু গোঁফ জোড়া এখনও চোখা, খাড়া হয়ে আছে।

কর্মব্যস্ত শহরের কেন্দ্রস্থলেও দেখা গেল ইঁদুর। কোথাও সিঁড়িতে, কোথাও বাড়ির পিছনে। কোন কোনটা দলছুট হয়ে ঢুকে পড়ে সরকারি অফিসে, স্কুলে, খেলার মাঠে, কাফের বারান্দায়।

শুধু সূর্য ওঠার সময় কিছুক্ষণ দেখা যায় না ওদের। সে সময় দৈনন্দিন আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ চলে। এরপর, আবার আরম্ভ হয় ওদের বের হওয়া। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকে। এভাবেই যায় সারাদিন। রাতে, রাস্তায় হাঁটলে পায়ের তলায় অনুভূত হয় বিজাতীয় একটি স্পর্শ। একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রাণীদেহের উষ্ণ-কোমল স্পর্শ।

২৫ এপ্রিল। বেতারে ঘোষণা করা হলো, এ কদিনে ছহাজার দুশো একান্নটা মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। এই অকল্পনীয় সংখ্যার কথা শুনে শহরবাসী দারুণ একটা আঘাত অনুভব করল স্নায়ুতে। ২৮ এপিল বেতার থেকে ঘোষণা করা হলো, প্রায় আট হাজারের মত মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। একটা অজানা ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল শহরবাসীর মনে। সবাই পালাতে চাইল উপকূল অঞ্চলে। ঠিক পরের দিন সকালে বেতারে বলা হলো, ইঁদুর মরা কমতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকদিন পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল শহরবাসী।

সেদিন দুপুরে গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাচ্ছে রিও, এমন সময় সে দেখল, একজন পাদ্রির কাঁধে ভর দিয়ে কোনরকমে ওর দিকে হেঁটে আসছে মিশেল। সামনে ঢলে পড়েছে মাথা। হাত পা কেমন বাঁকা বাঁকা দেখাচ্ছে। দম দেয়া পুতুলের মত ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে। পাদ্রির নাম ফাদার প্যানালু। ওরা কাছে না আসা পর্যন্ত গাড়িতেই বসে রইল রিও। কাছে আসতেই ও দেখল, মিশেল-এর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। নিশ্বাসের সাথে ওর নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিশ্রী একটা শব্দ।

বহু কষ্টে মিশেল বলল, 'আমার চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে

দেখাচ্ছিল। তাই হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় শরীরের সব জায়গায় ব্যথা অনুভব করলাম। ঘাড়ে, দুই বগলে আর পুরুষাঙ্গে।'

রিও হাত বুলিয়ে দেখল, ওর ঘাড়টা গিঁট পড়ার মত শক্ত, বেশ ফুলে উঠেছে। ও বলল, 'মিশেল, তুমি বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকো। আমি বিকেলে তোমাকে দেখতে আসব।'

মিশেল চলে যাওয়ার পর, রিও ফাদারের কাছে জানতে চাইল, 'ফাদার, ইঁদুর মরা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'আমার তো মনে হয় মহামারী শুরু হয়েছে।' চশমার বড় বড় কাচের আড়ালে জ্বলজ্বল করে উঠল ফাদার প্যানালুর চোখ।

বাড়ি ফিরে স্বাস্থ্যনিবাস থেকে পাঠানো স্ত্রীর টেলিগ্রামে চোখ বুলাচ্ছে রিও, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ভদ্রলোক ওর একজন পুরনো রোগী। নাম জোসেপ গ্রাঁদ। মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানি। আর্থিক অবস্থা ভাল না। তাই চিকিৎসার জন্যে রিও কোন ফি নেয় না ওর কাছ থেকে।

'ডাক্তার সাহেব, আমার এক প্রতিবেশীর হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আপনাকে এক্ষুণি প্রয়োজন।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল ভদ্রলোক।

কয়েক মিনিট পর, শহরের প্রান্তে, একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছুল রিও। নোংরা সিঁড়ি, দুর্গন্ধে ভরা। অর্ধেক পথ ওপরে উঠে ও দেখল, ওকে নেয়ার জন্যে খুব দ্রুত নেমে আসছে গ্রাঁদ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স লোকটার। বেশ লম্বা। হাঁটার সময় সামনে ঝুঁকে পড়ে শরীর। কাঁধ সরু। হাত-পা লিকলিকে। গোঁফ হলুদ, বিবর্ণ।

'ডাক্তার সাহেব, ওর অবস্থা এখন একটু ভাল। প্রথমে দেখে ভেবেছিলাম, হয়তো ওকে আর ফেরাতে পারব না,' কথাগুলো বলে কয়েকবার নাক ঝাড়ল গ্রাঁদ।

তিনতলায় পৌঁছে রিও দেখল বাঁ দিকের একটা দরজায় লাল চক দিয়ে লেখা: 'ভেতরে আসুন। গলায় দড়ি দিয়েছি।'

ঘরের ভেতর ঢুকল ওরা। মাঝখানে একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে। ছাদের হুক থেকে ঝুলছে দড়ি। খাবার টেবিলটা এক কোণে সরানো।

'ডাক্তার সাহেব, আমি তখন বাইরে যাচ্ছিলাম। এই ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেলাম ভেতর থেকে কেমন একটা চাপা গোঙানির শব্দ আসছে। এমন সময় ওই লেখাগুলোর ওপর আমার চোখ পড়ল। ঠিক তখুনি শুনতে পেলাম, ভেতর থেকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। যাক্, সময় থাকতে ওকে নামাতে পেরেছি। না হলে–,' মাথা চুলকাতে লাগল গ্রাঁদ।

দরজা ঠেলে পাশের কামরায় ঢুকল ওরা। ঘরটা পরিষ্কার ঝকঝকে। আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। একটা খাটের ওপর শুয়ে আছে একজন লোক। মনে হয় অসুস্থ। ঘন ঘন শ্বাস টানছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল সে। চোখ রক্তবর্ণ। রিও-র মনে হলো লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাসে ইঁদুরের কিচমিচ শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। ওর শরীরের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। ওকে অভয় দিয়ে রিও বলল, 'আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দু'একদিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার সাহেব।' লোকটার গলার স্বর ক্ষীণ।

গ্রাঁদ-এর কাছে রিও জানতে চাইল, 'পুলিসে খবর দিয়েছেন?'

মাথা নত করল গ্রাঁদ। বলল, 'না, এখনও জানাইনি। ভাবলাম, প্রথমে ডাক্তারকে...।' ওকে থামিয়ে রিও বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাক কী করা যায়।'

ওদের কথাবার্তা শুনে আতঙ্ক দেখা দিল লোকটার মাঝে। সঙ্গে

সঙ্গে বিছানায় উঠে বসল সে। বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আমি এখন ভাল আছি।'

'আপনি ভয় পাবেন না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আইনের খাতিরে এটা করতেই হবে। তাছাড়া, পুলিসকে জানানো আমার কর্তব্য,' ওকে বুঝিয়ে বলল রিও।

'ওহ,' কান্নায় ভেঙে পড়ল লোকটা।

গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে গ্রাঁদ বলল, 'মশিয়ে কটার্ড, শান্ত হোন। আপনি যদি এর পরে উল্টোপাল্টা কিছু করেন, তখন সব দোষ পড়বে ডাক্তার সাহেবের ঘাড়ে, বুঝতে পারছেন।'

কটার্ড-এর চোখ ভরে উঠল কান্নায়। বারবার বলল সে, 'বিশ্বাস করুন, এ ধরনের আর কিছু ঘটবে না। তখন পাগলামি চেপেছিল আমার মাথায়। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

প্রেসক্রিপশন লিখে কটার্ড-এর হাতে দিল রিও। বলল, 'বেশ, আপনার অনুরোধ রাখব। আপাতত জানাব না কাউকে। দিন দুই পর আবার এসে দেখে যাব আপনাকে। কিন্তু আপনি আর ছেলেমানুষী করবেন না।'

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রিও গ্রাঁদকে বলল, 'শুনুন, পুলিসে খবর দিতে আমি বাধ্য, তবে অফিসারকে অনুরোধ করব তিনি যেন তদন্তটা কয়েকদিন মুলতবি রাখেন। রাতে কারও থাকা দরকার। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ওর?'

'কাউকে তো দেখছি না। আমিও ভাল চিনি না ওকে। অবশ্য আজ রাতটা থাকতে পারি,' সৎ প্রতিবেশীর মত কথাটা বলল গ্রাঁদ।

নিচে নামার সময় নিজের অজান্তেই সিঁড়ির অন্ধকার কোণগুলোয় নজর বোলাল রিও। গ্রাঁদ-এর কাছে ও জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আপনাদের অঞ্চলে ইঁদুর মরা কমেছে?'

সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না গ্রাঁদ। ভাসা-ভাসা কিছু এ-

ব্যাপারে সে শুনেছে বটে, কিন্তু গুজবে কান দেয়া ওর স্বভাব নয়। তাছাড়া, এমনিতেই ভীষণ ব্যস্ত লোক সে।

ফেরার তাড়া ছিল রিও-র। স্ত্রীকে চিঠি লিখতে হবে। তবে সবার আগে যেতে হবে দারোয়ানের বাসায়। গ্রাঁদ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পথে নামল ও।

রিও শুনতে পেল, হকাররা সেদিনের তাজা খবর হেঁকে বেড়াচ্ছে। 'শহরের ইঁদুরের আর কোন চিহ্ন নেই। এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে ইঁদুর মরা।'

মিশেল-এর ঘরে ঢুকে রিও দেখল, একটা হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে আছে ও। আর এক হাত দিয়ে ঘাড়। সেই অবস্থায় বমি করছে। রঙ, ফিকে গোলাপী। বমি করার পর হাঁপাতে লাগল মিশেল। এর পর বিছানার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

থার্মোমিটার লাগিয়ে রিও দেখল একশো তিন ডিগ্রীর কাছাকাছি জ্বর মিশেল-এর। ওর গলা ফুলে উঠেছে, এবং শরীরের আরও অনেক জায়গার গ্রন্থি। দুই উরুতে ক্রমশ ফুটে উঠছে কালো কালো চাকা। মিশেল জানাল, শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। 'আগুন, মনে হচ্ছে আমার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।' অত্যধিক জ্বরে শুকিয়ে এসেছে ওর ঠোঁট; মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চাইছে না; চোখের কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মণি দুটো। বার কয়েক বলল মিশেল, তার ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।

মিশেল-এর বৌ উদ্বেগের সঙ্গে শুধাল, 'ডাক্তার সাহেব, দয়া করে বলুন, ওর কী হয়েছে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। অনেক কিছুই হতে পারে। এখন থেকে হালকা খাবার খাওয়াবে। আর যত পানি চাইবে, দেবে।'

বাসায় ফিরে ডাক্তার রিচার্ডকে টেলিফোন করল রিও। রিচার্ড ওর সহকর্মী, ভীষণ জমজমাট পশার। 'না, না। অস্বাভাবিক তেমন

কিছু এখন দেখিনি,' জানাল রিচার্ড।

'ভীষণ জ্বর। জ্বালাপোড়া আছে। শরীরের কোথাও কোথাও ফোলা। এমন রোগী...?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। মনে পড়েছে। এরকম দুজনকে দেখেছি।'

সে রাতে মিশেল-এর জ্বর পৌঁছুল একশো চারে। সারাক্ষণ প্রলাপ বকল ও। 'ওই ইতরগুলো...ওই ইতর ইঁদুরগুলো...ওই ইতরগুলোই এই সর্বনাশটা করেছে আমার।'

মিশেল-এর বৌকে রিও বলল, 'আজ রাতে তোমাকে ওর পাশে থাকতে হবে। খারাপ কিছু দেখলে আমাকে খবর দিও।'

পরের দিন, ৩০ এপ্রিল। আগের দিনের চেয়ে রাস্তাঘাটে কোলাহল আজ অনেক বেশি। ইঁদুর মরা বন্ধ হওয়ার খবর শুনে সবাইকে মনে হচ্ছে উচ্ছল, মুখর, আনন্দিত।

রিও-র মনও আজ বেশ হালকা। সকালের প্রথম ডাকেই স্ত্রীর চিঠি পেয়েছে। মিশেল-এর বাসায় এসে ও দেখল ওর জ্বর নিরানব্বইয়ে নেমে গেছে। কিছুটা দুর্বল দেখাচ্ছে, তবে হাসছে এখন।

'আমার মনে হচ্ছে ও আজ অনেকটা সুস্থ। আপনি কী বলেন?' জানতে চাইল মিশেল-এর বৌ।

'হতে পারে। তবে এত তাড়াতাড়ি কিছুই বলা যায় না,' উত্তর দিল রিও।

রিও-র কথাই ঠিক হলো। দুপুরে মিশেল-এর জ্বর লাফিয়ে উঠল একশো চারে। আবার দেখা দিল বিকার, বমি; অসম্ভব রকম ফুলে উঠল শরীরের গ্রন্থিগুলো; সামান্য ছোঁয়ায় যন্ত্রণা হচ্ছে এখন। রিও লক্ষ করল, মাথাটাকে উঁচু করে ধরে রাখার চেষ্টা করছে মিশেল।

মিশেল-এর বৌকে রিও বলল, 'ওকে এখুনি হাসপাতালে নিতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্যে ফোন করছি।'

দুইঘণ্টা পর। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর শুয়ে আছে মিশেল, মুখ হাঁ করে। দুই কষে ময়লা জমেছে। বিড়বিড় করে চলেছে ও, 'ওই ইতর ইঁদুরগুলো। ওগুলোকে জাহান্নামে পাঠাব। ওরাই আমার এই সর্বনাশটা করল।'

হাসপাতালে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল ওর মুখ। রক্তহীন ঠোঁট দুটো শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ বিরতি দিয়ে টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ওর হাত পা। মনে হলো বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে মিশেল।

'কোন আশা নেই, ডাক্তার?' মিশেল-এর পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদছে ওর বৌ।

'না। ও মারা গেছে।'

তিন

ইঁদুর মরার ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল শহরবাসী, মিশেল-এর মৃত্যুর ঘটনায় ওরা হলো আতঙ্কিত। দুটো ব্যাপারই ওদের কাছে মনে হলো অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।

জাঁ তারিউ ওরাওঁ-এর বাসিন্দা নয়। ইঁদুর মরার ঘটনা আরম্ভ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে আসে সে। উঠেছিল শহরের এক বিরাট হোটেলে। এতে বোঝা যায় সে বেশ বড়লোক। আরও কতগুলো গুণ আছে ওর। ভাল সাঁতারু, কৌতুকপ্রিয়, ঠোঁটে সব

সময় লেগে থাকে হাসি; জীবনকে উপভোগ করার সহজাত একটা আসক্তি আছে ওর।

প্রতিদিনের ঘটনা ডাইরিতে লিখে রাখত তারিউ। ওর ডাইরিতে সে সময়ের বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। ও লিখেছে:

'জানালা দিয়ে রাস্তার ও-পারে একটা ছোট্ট গলি দেখতে পাই। সেখানে এক বাড়ির ব্যালকনিতে রোজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটত।

'গলির দেয়ালের ছায়ায় ঘুমোয় বেশ কিছু বেড়াল। প্রতিদিন দুপুরের খাওয়ার পর ব্যালকনিতে আসেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর হাবভাব সৈনিকের মত। শরীরটা সব সময় টান টান করে রাখেন। পোশাকও সৈনিকদের মত। মাথার ধবধবে সাদা চুল সব সময় আঁচড়ানো থাকে।

'ব্যালকনিতে ঝুঁকে, তিনি ডাকেন: পুষি, পুষি। বেড়ালগুলো ঘুমজড়ানো চোখে তাঁর দিকে তাকায়। কিন্তু ওঠার কোন লক্ষণ দেখা যায় না ওদের মধ্যে।'

'বৃদ্ধ এরপর কাগজ কুচি কুচি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো ছুঁড়ে মারেন নিচে। এবার, ওগুলোকে ধরার জন্যে এগিয়ে যায় বেড়ালগুলো। থাবা উঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করে।

'এ সময় বেড়ালগুলোকে থুতু ছিটান বুড়ো ভদ্রলোক। থুতু ওদের গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে ডগমগ করে ওঠেন তিনি।'

এগুলো শহরে ইঁদুর মরা শুরু হওয়ার আগের ঘটনা। যখন ইঁদুর মরা আরম্ভ হলো সে-সময় জাঁ তারিউ লিখেছে:

'আজ ব্যালকনির বুড়োর চেহারায় কেমন হতাশার ভাব। গলির ছায়ায় বেড়ালগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না। রাস্তায় মরা ইঁদুর দেখে হয়তো শিকারী স্বভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ওদের। ভীষণ মনমরা হয়ে আছেন বুড়ো। চুল আঁচড়াননি। সৈনিকের ভাবভঙ্গি নেই। মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন।

'কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে গেলেন তিনি। ফেরার আগে থুতু ছিটালেন রাস্তায়। কিন্তু আজ থুতুর দলা পড়ল শূন্য রাস্তার মাঝখানে।'

তারিউ-এর ডাইরির এক জায়গায় লেখা ছিল: 'আজ একটা ট্রামকে রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ থেমে পড়তে দেখলাম। ট্রাম থামতেই তড়িঘড়ি নেমে পড়ল তিনজন তরুণী। পরে শুনেছিলাম, ট্রামের ভেতর একটা মরা ইঁদুর পাওয়া গিয়েছিল।'

তারিউ যে হোটেলে থাকত তার পাহারাদার সম্পর্কে ও লিখেছে: 'একদিন পাহারাদার আমাকে বলল, "এভাবে দলে দলে ইঁদুর বেরিয়ে আসার অর্থ সামনে বিপদ আসছে।" "কী ধরনের বিপদ?" আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম। "তা কেমন করে বলব? তবে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হলেও অবাক হব না।" উত্তর দিল ও।'

এক পরিবারের কথা লিখেছে তারিউ। 'আমাদের হোটেলে খেতে আসে। দেখতে অদ্ভুত লাগে ওদের। কর্তা রোগা, দীর্ঘদেহী। পরনে কালো কোট-প্যান্ট। এই রঙের কোন বদল হয় না। কড়া ইস্ত্রি করা শার্টের কলার কড়কড়ে। মাথায় বিশাল টাক। ছোট ছোট চোখ। ছুঁচালো নাক। মুখটা প্যাঁচার মত। নাম মশিয়ে অথন। পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট। হোটেলের দরজায় প্রথমে তাকেই দেখতে পাই। কিন্তু তারপর একটু পাশে সরে দাঁড়ান তিনি। হোটেলে প্রথমে ঢোকেন তাঁর স্ত্রী।

'ভদ্রমহিলা ক্ষীণাঙ্গী। দেখতে অনেকটা কালো ইঁদুরের মত। স্ত্রীর পর ঢোকেন মশিয়ে অথন। এরপর, তাদের অনুসরণ করতে করতে ঢোকে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। দেখলে মনে হয় এক জোড়া পুতুল।

'খাবার টেবিলের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন মশিয়ে অথন। প্রথমে বসেন তাঁর স্ত্রী। তারপর বসে বাচ্চা দুটো। সবার শেষে

মশিয়ে অথন।

'আজ দেখলাম, ইঁদুর মরার ব্যাপার নিয়ে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ছেলেটা। এ সম্পর্কে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু ধমকে উঠলেন মশিয়ে অথন। "ফিলিপস, তোমার বোঝা উচিত, খাবার টেবিলে কেউ ইঁদুর নিয়ে কথা বলে না।" "তোমার বাবার কথাই ঠিক।" প্যাঁচা-স্বামীকে সমর্থন করলেন ইঁদুর-পত্নী। খুদে পুতুল দুটো এরপর যতদূর সম্ভব ওদের খাবার প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজেদের মুখ আড়াল করে রাখল।'

ওর হোটেলের ম্যানেজারের কথাও লিখেছে তারিউ। 'আজকাল ওকে ইঁদুর ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে খুব একটা কথা বলতে দেখি না। ওর তিন-তারা হোটেলে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে, এ জন্যে মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও।

'সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওকে একদিন বললাম, "আমরা সবাই এখন একই নৌকার যাত্রী।" "ঠিক বলেছেন।" বেশ খুশি মনে হলো ম্যানেজারকে।

'ওর মুখ থেকেই প্রথম আমি এক ধরনের জ্বরের কথা শুনলাম। জানাল, ওর হোটেলের একজন পরিচারিকাকে ওই রোগ ধরেছে। তারপর আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ও বলল, "আমার বিশ্বাস রোগটা ছোঁয়াচে নয়।" আমি বললাম, "তাতে আমার নিজের কিছু যায় আসে না।" শুনে বেশ জোর দিয়ে ও বলল, "আপনিও দেখছি আমার মতই ভাগ্যে বিশ্বাস করেন।" "আমি অদৃষ্টবাদী নই," ওকে জানালাম।'

চার

মিশেল-এর লাশটা আলাদা ওয়ার্ডে রাখার বন্দোবস্ত করে ডাক্তার রিচার্ডকে টেলিফোন করল রিও।

'এই রোগ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?' রিচার্ড-এর কাছে জানতে চাইল ও।

'না, এখনও কিছু আন্দাজ করতে পারিনি,' নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করল রিচার্ড। 'আমার হাতে মারা গেছে দুজন। একজন আটচল্লিশ ঘণ্টা পর। অপরজন তিনদিন পর।'

'এ ধরনের রোগী পেলে দয়া করে আমাকে একটু জানিয়ো,' ওকে অনুরোধ করল রিও।

আরও দুজন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করল সে। ওদের কাছ থেকে জানতে পেল, ইতিমধ্যে বিশজনের মত মারা গেছে। আবার রিচার্ডকে টেলিফোন করল ও। রিচার্ড মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। ওকে অনুরোধ করল রিও, এ ধরনের নতুন রোগীদের যেন আলাদা ওয়ার্ডে রাখা হয়।

'দুঃখিত,' বলল রিচার্ড। 'জেলা কর্তৃপক্ষের হুকুম ছাড়া তা করা যাবে না। কিন্তু রোগটা কী ছোঁয়াচে?'

'তেমন লক্ষণ আমি এখনও পাইনি। তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক,' উত্তর দিল রিও। রিচার্ড ওকে আশ্বাস দিল, ব্যাপারটা উর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষকে জানাবে।

এ-দিকে ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে শহরের আবহাওয়া। মিশেল মরার পরের দিন, গোটা আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে মেঘে। পরপর কয়েকবার মুষলধারে বৃষ্টি হলো। কিন্তু বৃষ্টির কয়েক ঘণ্টা পর আবহাওয়া আবার হয়ে উঠল গরম, ভ্যাপসা।

শুধু রিও-র হাঁপানি রোগীর কাছে আবহাওয়াটা মনে হচ্ছিল অন্য রকম। মনে-প্রাণে যেন এরকমই চাইছিল বুড়ো। 'মনে হচ্ছে, শরীরের ভেতরটা সেদ্ধ করে ফেলছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তবে হাঁপানি রোগীর জন্যে এমন আবহাওয়াই দরকার।'

আত্মহত্যা চেষ্টার ঘটনাটা তদন্তের ব্যাপারে কটার্ড-এর ফ্ল্যাটে এল রিও। পুলিস অফিসার তখনও আসেনি। ওঠার সময় সিঁড়িতে দেখা হলো গ্রাঁদ-এর সঙ্গে। গ্রাঁদ রিওকে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকল। দুটি মাত্র ঘর। তেমন আসবাবপত্র নেই। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত দুটি জিনিস আছে। একটা বইয়ের শেলফ, অভিধানে ঠাসা। অন্যটা ব্ল্যাক বোর্ড।

গ্রাঁদ বলল, 'কটার্ড সকাল থেকে মাথায় খুব যন্ত্রণা অনুভব করছে।'

গ্রাঁদকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাছাড়া উত্তেজিত মনে হলো ওকে। সারাক্ষণ পায়চারি করছে ঘরের ভেতর। টেবিলের ওপর একটা থলে আর একটা ব্যাগ পড়ে আছে। বারবার ওগুলো খুলছে আর বন্ধ করছে।

কথার ফাঁকে গ্রাঁদ রিওকে জানাল, কটার্ড-এর ব্যাপারে বেশি কিছু ও জানে না। সিঁড়িতে দেখা হলে শুভেচ্ছা বিনিময় হত, এই পর্যন্তই। তবে লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির। 'আমার সঙ্গে মাত্র দুবার কথা হয়েছে। কয়েক দিন আগে এক প্যাকেট রঙিন চক কিনে আমি ঘরে ফিরছিলাম। সিঁড়িতে প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে চকগুলো

ছড়িয়ে যায়। লাল এবং নীল রঙের চক ছিল ওখানে। কটার্ড ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওগুলো তুলতে সাহায্য করে আমাকে। সে সময় ও প্রশ্ন করেছিল, "রঙিন চক দিয়ে আপনি কী করবেন?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি ল্যাটিন ভাষা চর্চা করি।", শুনে বেশ আগ্রহ দেখাল ও, এবং আমার কাছে একটা চক চাইল। আমি এতে আশ্চর্য হলেও ওকে একটা চক দিয়েছিলাম,' কথা শেষ করল গ্রাঁদ।

'আর অন্যবার কী কথা হয়েছিল?' ওর কাছে জানতে চাইল রিও।

গ্রাঁদ উত্তর দেয়ার আগেই একজন কেরানিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল পুলিস অফিসার। বলল, 'আমি প্রথমে মশিয়ে গ্রাঁদ-এর বক্তব্য শুনব।'

রিও লক্ষ করল, কটার্ড-এর কথা বলতে গিয়ে গ্রাঁদ কয়েকবার উচ্চারণ করল 'এই হতভাগ্য লোকটা' এবং 'ওর দুর্জয় সংকল্প'।

'আত্মহত্যা করতে চাইবার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?' প্রশ্ন করল অফিসার।

উত্তর দিতে গিয়ে গ্রাঁদ উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে বেশ সময় নিল। শেষে বলল, 'কোন গোপন বেদনা!'

' "কোন গোপন বেদনা" বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

'এক রাতে আমার দরজায় টোকা দেয় কটার্ড। আমি দরজা খুললে আমার কাছে একটা ম্যাচের কাঠি চায়। আমি ওকে একটা গোটা বাক্স দিয়ে দিই।'

'ওর আচরণে অস্বাভাবিক কিছু ছিল কী?'

'হাবভাবে বুঝতাম আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু ও জানত আমার কাজ নিয়ে আমি ভীষণ ব্যস্ত।'

এবার অফিসার রিওকে বলল, 'আমি এখন অসুস্থ লোকটাকে দেখতে চাই।'

কটার্ডকে কিছু ধাতস্ত হতে সময় দেয়ার জন্যে প্রথমে ওর ঘরে একাই ঢুকল রিও। খাটের ওপর বসে আছে কটার্ড। গায়ে ধূসর একটা শার্ট। চোখে-মুখে আতঙ্ক। উৎকণ্ঠা নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'পুলিস এসেছে, তাই না?' রিওকে দেখে জানতে চাইল কটার্ড।

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? মামুলি কয়েকটা প্রশ্ন করেই চলে যাবে,' ওকে অভয় দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রিও, পিছন থেকে ডাকল কটার্ড। রিও কাছে যেতেই ওর হাত চেপে ধরল ও।

'অসুস্থ লোককে নিশ্চয় ওরা বিরক্ত করে না,' ওর কণ্ঠে ঝরে পড়ল মিনতি।

'এমন ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না,' আবার ওকে অভয় দিল রিও। কথাগুলো শুনে সুস্থ বোধ করল কটার্ড। অফিসারকে আনতে বেরিয়ে গেল রিও।

গ্রাঁদ যা যা বলেছিল পড়ে শোনানো হলো কটার্ডকে। এরপর অফিসার আরম্ভ করল জেরা।

'আত্মহত্যা করতে চাইছিলেন কেন?'

'গ্রাঁদ-এর কথাই ঠিক। "কোন গোপন বেদনা"র কারণে।'

'ভবিষ্যতেও এমন করার ইচ্ছা আছে নাকি?' ধমক দিল অফিসার।

'না, নিশ্চয় না। আমি একটু শান্তি চাই।'

'শুনুন,' কড়া গলায় বলল অফিসার, 'আপনি সবার শান্তি নষ্ট করেছেন।' চোখের ইশারায় অফিসারকে থামতে বলল রিও। বিদায় নেয়ার সময় অফিসার ওর কাছে জানতে চাইল, 'ডাক্তার সাহেব,

যেভাবে লোক মরা যাচ্ছে তাতে শহরে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কী?'

'স্পষ্ট করে কিছু বলা কঠিন।'

'হয়তো আবহাওয়ার জন্যেই এমন হচ্ছে,' মন্তব্য করল অফিসার।

সত্যি, দিনদিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে আবহাওয়া। যত বেলা বাড়ে কোনকিছুতে হাত দিলে মনে হয় কেমন যেন আঠা আঠা লাগছে।

এক একজন রোগী দেখে বাসায় ফেরে রিও, আর বাড়ে ওর উদ্বেগ। সেদিন সন্ধ্যায়, শহরতলিতে হঠাৎ একজন শুরু করল বমি। প্রচণ্ড জ্বরে ছটফট করতে করতে পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে অবিরাম প্রলাপ বকতে লাগল লোকটা। একটা গ্ল্যান্ড টসটস করছিল পুঁজে; দেখতে দেখতে পাকা ফলের মত ফেটে গেল ওটা।

শহরের সবগুলো এলাকা থেকেই ঘন ঘন ডাক আসতে লাগল রিও-র। গ্ল্যান্ডগুলোর ওপর আড়াআড়িভাবে দুটো টান দেয় ও। অমনি পুঁজ আর রক্ত একসাথে ঠেলে বের হতে থাকে। হাত-পা ছড়িয়ে নেতিয়ে পড়ে রোগী। পা এবং পেটের বিভিন্ন জায়গায় ফুটে ওঠে কালো কালো চাকা। রোগী মারা যায়।

শহরে, ইঁদুরের মত দলে দলে মরতে আরম্ভ করল মানুষ। ইঁদুর মরেছে প্রকাশ্যে, রাস্তাঘাটে। মানুষ মরছে আড়ালে, বাড়ির ভেতর। এজন্যেই সাংবাদিকরা ব্যাপারটার ভয়াবহতা অতখানি বুঝতে পারল না। শুধু জানল ডাক্তাররা। ওরা বুঝতে পারল মহামারী শুরু হয়েছে।

একদিন রিও-র সঙ্গে দেখা করতে এলেন ডাক্তার ক্যাসেল। বয়সে তিনি রিও-র চেয়ে অনেক বড়, এবং অভিজ্ঞ।

'রিও, রোগটা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ তুমি?'

'মৃতদেহ পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'রিপোর্টে কী পাওয়া যাবে তা আমি আগেই জানি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বহু আগেই তো পশ্চিম ইওরোপ থেকে এ-রোগ উধাও হয়েছিল। রোগটা তুমিও নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছ।'

চিন্তায় ডুবে গেল রিও। চোখ মেলে দিল জানালার বাইরে। দূর-দিগন্তকে ঘিরে আছে উঁচু উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। নিষ্প্রভ হয়ে আসছে আকাশের আলো।

'দেখো, ক্যাসেল,' বলল ও, 'ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কিন্তু লক্ষণ দেখে আমার আর কোন সন্দেহ নেই–প্লেগই শুরু হয়েছে।'

পাঁচ

জানালায় দাঁড়িয়ে নিচে, শহরের দিকে তাকিয়ে আছে রিও। মনে করার চেষ্টা করছে প্লেগ নিয়ে কখন কী পড়েছে। আস্তে আস্তে স্মৃতিতে ভেসে উঠল ইতিহাসের পাতা। ওগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে ও দেখল আজ পর্যন্ত তিরিশটা বড় বড় প্লেগ এসেছে পৃথিবীতে। মারা গেছে দশ কোটির মত মানুষ। মনে পড়ল কনস্ট্যান্টিনোপল-এর প্লেগের কথা; একদিনে দশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল ওখানে।

সত্তর বছর আগে ক্যান্টনে দেখা দিয়েছিল প্লেগ। মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ার আগে মরেছিল চল্লিশ হাজার ইঁদুর।

লাশে ভরে গিয়েছিল এথেন্স নগরী, কাকপক্ষীরাও পালিয়েছিল শহর থেকে।

ফ্রান্সের মার্সাই শহরে বিরাট বিরাট গর্তে গলিত লাশ ছুঁড়ে মেরেছিল কয়েদীরা।

প্রঁভে শহরে গড়ে তোলা হয়েছিল বিশাল প্রাচীর, যেন প্লেগের দূষিত বাতাস ঢুকতে না পারে শহরের ভেতর।

কনস্ট্যান্টিনোপলে, আশ্রমগুলোর শতচ্ছিন্ন খড়ের গদির ওপর ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য গলিত শবদেহ। বিছানা থেকে আঁকশির সাহায্যে টেনে তুলতে হয়েছিল ওগুলো।

ইতালির মিলানে ঘটেছিল ইতিহাসের জঘন্যতম বিকৃত ঘটনা। একদিকে প্লেগের প্রকোপে মানুষ সন্ত্রস্ত, অন্যদিকে উদাসীন নর-নারী কবরস্থানে মিলিত হয়েছে সঙ্গমে।

লন্ডন দৈত্যপুরীর মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় শুধু শোনা যেত শবদেহবাহী শকটের নিরন্তর ঘর্ঘর শব্দের প্রতিধ্বনি।

রাতের আঁধারে এথেন্স এর সমুদ্রতীরে জড়ো হয়েছিল অগণিত মানুষ। কাঁধে ওদের আত্মীয়-পরিজনের মৃতদেহ। সবাই চাইছিল শুকনো মাটিতে লাশগুলোকে কবর দিতে। কিন্তু স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সবার হাতে ছিল মশাল। সেই মশাল দিয়ে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ওদের ভেতর।

ছয়

ঝি খবর দিল গ্রাঁদ এসেছে। গ্রাঁদ মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানি হলেও পরিসংখ্যান দপ্তরে জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার কাজ মাঝে মাঝে করতে হয় ওকে। সে কারণেই গত কয়েকদিন ধরে যেসব মৃত্যু ঘটছিল তার একটা হিসেব রাখার দায়িত্ব পড়েছিল ওর ওপর। কৃতজ্ঞতাবোধ ওর চরিত্রের বিশেষ একটা গুণ, সেজন্যেই স্বেচ্ছায় মৃতের সর্বশেষ সংখ্যা সংবলিত একটা রিপোর্ট সে নিয়ে এসেছে ডাক্তারের কাছে।

একখণ্ড কাগজ নাচাতে নাচাতে ঘরে ঢুকল গ্রাঁদ। প্রতিবেশী কটার্ডকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। 'মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, ডাক্তার। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় এগারো জন মারা গেছে।'

কটার্ড-এর সঙ্গে করমর্দন করে রিও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আপনাকে ও ধন্যবাদ জানাতে এসেছে। আপনাকে অহেতুক ঝামেলায় ফেলার জন্যে বেচারি দুঃখিত,' বলল গ্রাঁদ।

রিও ততক্ষণে চোখ বুলাতে শুরু করেছে রিপোর্টে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। 'না, আর দেরি নয়। রোগের নামটা ঘোষণা করতে হবে। আমি এখনি ল্যাবরেটরিতে যাব। আপনারা যাবেন আমার সঙ্গে?'

'ঠিক বলেছেন আপনি,' রিও-র সঙ্গে নামতে নামতে বলল গ্রাঁদ।

'সত্য গোপন না রাখাই ভাল।'

প্যালেস দ্য আর্মস-এর দিকে হাঁটা ধরল ওরা তিনজন। তখন সন্ধ্যা নামছে। 'মাফ করবেন,' প্যালেসের কাছাকাছি পৌঁছে বলল গ্রাঁদ। 'আমাকে ফিরতে হবে। সন্ধেবেলাটা আমার কাছে বড় পবিত্র।'

'সত্যি কথা বলেছে ও,' এতক্ষণে মুখ খুলল কটার্ড। 'সন্ধের পর কেউ ওকে ঘর থেকে বেরুতে দেবে না।'

'আপনাকে কি অফিসে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়?' প্রশ্ন করল রিও।

'না, না, তা নয়। আমার নিজের কিছু কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত আমি,' জানাল গ্রাঁদ।

'তাই? তা কেমন চলছে কাজ?'

'একটানা কয়েক বছর হলো লেগে আছি। তাই কিছু করতে পারিনি বললে আশ্চর্য শোনাবে। কিন্তু কিছুই যে করতে পারিনি সেটাও সত্যি।'

'জানাতে আপত্তি না থাকলে বলবেন, কী করছেন?'

গ্রাঁদ-এর কান দুটো বেখাপ্পা রকমের বড়, টুপির বাইরে বেরিয়ে থাকে। এক হাতে টুপিটা টেনে কান দুটো ঢেকে নিল ও। তারপর বিড়বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা মন্তব্য করল। রিও যেটুকু বুঝল তার অর্থ—'কাজটা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংক্রান্ত।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল গ্রাঁদ। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট ডুমুর গাছের সারি। ছোট ছোট পা ফেলে ফিরে চলল ও।

ল্যাবরেটরির দরজায় পৌঁছে কটার্ড বলল, 'আমার একটা ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রয়োজন। একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পকেটের ভেতর গ্রাঁদ-এর দেয়া রিপোর্টটা নাড়াচাড়া করতে

করতে কটার্ডকে রিও বলল, 'কাল যখন রোগী দেখতে বসব তখন আসুন।' পরক্ষণে মত বদলে বলল, 'কাল আপনাদের ওদিকে রোগী দেখতে যাব আমি। ফেরার সময় আপনার ওখানে আসব।'

কটার্ড চলে যাবার পর নিজের অজ্ঞাতেই গ্রাঁদকে নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করল রিও। লোকটা কেমন যেন রহস্যময়। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সবসময় রোগের আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারে, ও সেই শ্রেণীর মানুষ। দেখতে লম্বা। হ্যাংলা। মাপের চেয়ে এক সাইজ বড় পোশাক পরে। ওর ধারণা পোশাক ঢোলা হলে টেকে বেশি। ওপরের মাড়িতে একটাও দাঁত নেই লোকটার। হাসলে গুটিয়ে যায় ওপরের ঠোঁটখানা। মুখটাকে তখন মনে হয় একটা কালো ফোকর।

রাস্তায় ওকে হাঁটতে দেখলে মনে হয় একজন পাদ্রি হাঁটছে। পথ পেরোয় দেয়াল ঘেঁষে। কোন্ ফাঁক দিয়ে কোথায় চলে যায় বোঝাই যায় না। মনে হয় ও একটা ইঁদুর। মাঝে মাঝে ওর গা থেকে ভেসে আসে তামাক আর সিঁড়ি-ঘরের গন্ধ। এক কথায় তাৎপর্যহীন একজন মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লোকটার আছে।

ভীষণ লাজুক গ্রাঁদ। কখনও প্রতিবাদ করতে পারে না। তাছাড়া, নিজের মনোভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাও খুঁজে পায় না সে, সব সময় হাতড়াতে থাকে শব্দ।

'ডাক্তার সাহেব, আপনি যদি বুঝতেন,' প্রায়ই ওকে বলে গ্রাঁদ, 'নিজের মনোভাব কিভাবে প্রকাশ করা যায় তা শেখার জন্যে আমার প্রাণে কী যে আকুলতা!'

গ্রাঁদকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে রিও-র মনে হলো, নিশ্চয় ও বই বা তেমন কিছু একটা লেখার কাজে ব্যস্ত।

সাত

পরের দিন, কর্তৃপক্ষকে রোগের ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাল রিও। প্রিফেক্ট-এর অফিসে স্বাস্থ্য কমিটির সভায় বসতে রাজি হলো সবাই।

আসার পথে ডাক্তার ক্যাসেলকে নিজের গাড়িতে তুলে নিল রিও। 'শুনেছ,' ক্যাসেল বলল, 'সারা জেলায় নাকি এক গ্রাম সিরামও নেই।'

'হ্যাঁ, জানি। ডিপোতে টেলিফোন করেছিলাম। আমার কথা শুনে চমকে উঠেছিল ডিরেক্টর। সিরাম এখন প্যারিস থেকে আনতে হবে। কাল টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।'

ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন প্রিফেক্ট। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হলো না, চাপা ক্রোধে জ্বলছেন তিনি। 'আসুন কাজ শুরু করি,' ডাক্তারদের লক্ষ করে বললেন প্রিফেক্ট, 'আশা করি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।'

'না, তার দরকার হবে না,' বলল ডাক্তার রিচার্ড। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থায় কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত...'

'না, আমাদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে ' রিচার্ডকে বাধা দিয়ে বলল ক্যাসেল, 'রোগটা সত্যি প্লেগ কিনা তা জানা।'

এ কথার প্রতিবাদ করল দু'তিনজন ডাক্তার। ইতস্তত করল অন্যরা। একটু চমকে উঠলেন প্রিফেক্ট।

'এই মুহূর্তে সবার উচিত আতঙ্ক না ছড়ানো। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়,' বলল রিচার্ড।

'রোগটা প্লেগ নয়, এ-কথা বললে আপনাদের যদি দুশ্চিন্তা হালকা হয় তাহলে তা বলতে আমি রাজি আছি,' বলল ক্যাসেল।

'আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না,' বললেন প্রিফেক্ট। মেজাজ বিগড়ে গেছে তাঁর।

রিওকে ওর মতামত জানানোর জন্যে অনুরোধ করা হলো। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি সে।

'এ পর্যন্ত যত রোগী পেয়েছি,' বলল রিও, 'তাদের জ্বরটা টাইফয়েডের মত। সঙ্গে বমি, গ্রন্থিস্ফীতি। পুঁজ পরীক্ষা করে দেখেছি ওতে প্লেগের জীবাণু পাওয়া গেছে, কিন্তু জীবাণুর মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্লেগের সঙ্গে মেলে না।'

'তাহলে আমাদের কাজ হবে আরও কিছুদিন লক্ষ করা,' বলল রিচার্ড।

'না। দিন দিন এই সংক্রমণ বাড়ছে। এখুনি ব্যবস্থা নেয়া না হলে দুমাসের মধ্যে শহরের অর্ধেক মানুষ মারা যাবে।'

'এ ধরনের বিভীষিকার চিত্র কল্পনা করা আমাদের ভুল হচ্ছে। তাছাড়া রোগটা যে সংক্রামক তার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। রোগীর পাশে থেকেও অনেকে সুস্থ আছে।'

'এর উল্টো প্রমাণও আছে। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে রোগ প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?'

'সংক্রমণ আপনাআপনি বন্ধ না হলে তখন প্রতিষেধক ব্যবহার করতেই হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সরকারিভাবে ঘোষণা করতে হবে প্লেগ দেখা দিয়েছে।'

'এ ব্যাপারে সব ক্ষমতা প্রিফেক্টকে দেয়া আছে।'

'ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন প্রিফেক্ট।

'সেক্ষেত্রে পেশাদার ডাক্তারদের আগে ঘোষণা করতে হবে যে রোগটা প্লেগ।'

'কিন্তু আমরা, ডাক্তাররা, যদি একমত না হতে পারি, তাহলে একটা ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে হবে আপনাদের। হয়তো দেখা যাবে শহরের অর্ধেক মানুষ মরা গেছে,' বলল রিও।

'আমার সহকর্মী পুরোপুরি বিশ্বাস করেন, রোগটা প্লেগই। ওর কথা থেকেও তাই মনে হচ্ছে,' বলল রিচার্ড।

'আমি যা দেখেছি তাই বলেছি। আমি এখন জানতে চাই আমার সহকর্মী কি এমন কথা বলতে রাজি আছেন যে কোনরকম প্রতিষেধক ছাড়াই এই রোগ ভাল হয়ে যাবে?'

এবার ইতস্তত করল রিচার্ড। 'তুমি বিশ্বাস করো রোগটা প্লেগ?'

'রোগের নাম আমি কী বলি না বলি সেটা বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে সময়ের।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে,' বললেন প্রিফেক্ট, 'আপনার অভিমত হচ্ছে রোগটা প্লেগ না হলেও তারই প্রতিরোধ ব্যবস্থা এখনি নিতে হবে।'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন,' বলল রিও।

নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করল ডাক্তাররা। রিচার্ডকে ওদের মুখপাত্র নির্বাচন করা হলো। উঠল প্রতিবাদের ঝড়। দেখানো হলো নানারকম ভয়। কমিটি-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল রিও।

কয়েক মিনিট পর। শহরতলির দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে রিও। চারদিকে মাছ ভাজা আর পেচ্ছাপের ঝাঁঝাল গন্ধ। হঠাৎ কোথা থেকে এসে ওর গাড়ির সামনে দাঁড়াল এক স্ত্রী লোক। যন্ত্রণায় চিৎকার করছে সে; ঊরু বেয়ে নামছে রক্তের ধারা।

আট

মীটিং-এর পরের দিন রোগের কামড়ানি আরও কিছুটা বাড়ল। এই প্রথম মানুষ মরার খবর বেরুল দৈনিক কাগজগুলোয়। একদিন পর, রিও লক্ষ করল শহরের বেশকিছু জায়গায় টানানো হয়েছে সরকারি নোটিস। মানুষের ভেতর যাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রেখে খুব সাবধানে সাজানো হয়েছে এর ভাষা।

'ওরাওঁ শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এক ধরনের সাংঘাতিক রোগের খবর পাওয়া গেছে; রোগটা সংক্রামক কিনা তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না; কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন, প্রতিটি নাগরিক মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে।'

কর্তৃপক্ষ কী কী ব্যবস্থা নেবেন তার একটা খসড়া দেয়া হয়েছে নোটিসে। তাতে বলা হয়েছে: নালা নর্দমায় বিষাক্ত গ্যাস ঢেলে খতম করা হবে ইঁদুর; পানি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে রাখা হবে কঠোর দৃষ্টি; অসুস্থ মানুষের জন্যে হাসপাতালে খোলা হয়েছে বিশেষ ওয়ার্ড।

মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে নোটিসে। উপদেশ দেয়া হয়েছে: কেউ যদি নিজের শরীরে ঘনঘন মাছি বসতে দেখেন, তাহলে তক্ষুণি মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে খবর দেবেন; বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে

জানাবেন; তাকে পাঠাতে হবে বিশেষ ওয়ার্ডে।

আরও কিছু অতিরিক্ত নিয়ম পালনের নির্দেশ রয়েছে নোটিসে। তার একটা হচ্ছে: রোগীর ঘর এবং যে গাড়িতে রোগী চলাফেরা করেছে সেগুলো যাতে জীবাণুমুক্ত থাকে, তার জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে ওগুলোতে জীবাণু-নাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

নোটিস পড়ে হাসপাতালের দিকে চলল রিও। ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল গ্রাঁদ। রিওকে দেখেই নাটকীয়ভাবে দুই হাত তুলল ও।

'হ্যাঁ, শুনেছি,' বলল রিও, 'মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।'

আগের দিন দশজন মরার খবর পাওয়া গেছে।

'সম্ভবত সন্ধেয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে। তখন আমি কটার্ড-এর কাছে যাব,' গ্রাঁদকে বলল রিও।

'তাহলে ওর খুব উপকার হয়,' গ্রাঁদ বলল, 'ভদ্রলোক হঠাৎ যেন পাল্টে গেছেন।'

'কিভাবে?'

'আগের চেয়ে ওকে এখন অনেক অমায়িক মনে হয়।'

'আগে অমায়িক ছিল না?'

প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল গ্রাঁদ। কটার্ড অমায়িক নয়, এটা ও বলতে পারে না। তবে কটার্ড কিছুটা চুপচাপ আর গোপন স্বভাবের মানুষ। কখনও কখনও সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে চুপি চুপি।

কটার্ড গ্রাঁদকে জানিয়েছে, ও মদজাতীয় পানীয়-র বিক্রেতা। প্রায়ই ওর কাছে দু'তিনজন লোককে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে গ্রাঁদ। হয়তো ওর খদ্দের।

মাঝে মাঝে সিনেমা হলে ঢোকে কটার্ড। যেসব ছবিতে মারামারি গোলাগুলি আছে সেগুলো দেখার ঝোঁক একটু বেশি ওর।

মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে কটার্ড। মানুষ সম্পর্কে ভীষণ সন্দেহপরায়ণ ও। কিন্তু গ্রাঁদ লক্ষ করেছে, কিছুদিন থেকে একেবারেই পাল্টে গেছে মানুষটা।

'ইদানীং সবার সঙ্গে ও একটা ভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। নিজেই যেচে আমার সঙ্গে কথা বলে,' গ্রাঁদ বলল।

'ইঁদুর মরা দেখে হয়তো ওর মাথায় গোলমাল হয়েছিল,' মন্তব্য করল রিও, 'আর এখন জ্বর দেখে খুব ঘাবড়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় আপনার ধারণা ঠিক নয়। আমার মতে...,' কথার মাঝপথে থেমে গেল গ্রাঁদ। একটা বিকট ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের সামনে দিয়ে পার হলো ইঁদুর ধ্বংসকারী ভ্যান।

'আমার ধারণা কোন ব্যাপারে ও ওর বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে আছে,' গম্ভীরভাবে বলল গ্রাঁদ।

•

বিকেলে ক্যাসেল-এর সঙ্গে কথা হলো রিও-র। প্যারিস থেকে এখনও সিরাম এসে পৌঁছায়নি।

'এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বলল রিও। 'সিরাম আদৌ কোন কাজে লাগবে কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে। জীবাণুগুলো কেমন অদ্ভুত।'

'দেখো, রিও,' ওকে বাধা দিয়ে বলল ক্যাসেল। 'আমি তোমার সাথে একমত নই। এগুলো আসলেই অদ্ভুত। কিন্তু আসলে ওরা একই গোষ্ঠীর।'

সন্ধ্যায় কটার্ড-এর বাসায় গেল রিও। খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে একটা ডিটেকটিভ বই, খোলা।

'আপনার শরীর কেমন?' জানতে চাইল রিও।

'মোটামুটি ভালই,' চেয়ারে বসে বেশ ঝাঁঝের সাথে বলল কটার্ড। 'কেউ জ্বালাতন করবে না এই নিশ্চয়তা থাকলে আরও ভাল থাকতাম।'

'মানুষ সবসময় একা থাকতে পারে না।'

'আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি তা বলিনি। আমি বলছিলাম সেইসব লোকের কথা, যারা একজন মানুষের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল দেখায় মানুষটিকে বিপথে ফেলার জন্যে।'

'আমি আপনার সাথে একমত। এ ধরনের অধিকার কারুর নেই। কিন্তু আপনার উচিত মাঝে মাঝে বাইরে বেরুনো। এভাবে সারাক্ষণ ঘরে থাকা ঠিক নয়।'

'বাসায় আর কতক্ষণ থাকি। সবসময় তো বাইরে বাইরেই ঘুরতে হয়,' বেশ বিরক্তির সুরে বলল কটার্ড।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল কটার্ড-এর ঘর। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল রিও। ওকে অনুসরণ করল কটার্ড।

'হঠাৎ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, আপনার ওয়ার্ডে ভর্তি করবেন তো?'

'অবশ্যই।'

'হাসপাতাল থেকে পুলিস কখনও অসুস্থ মানুষকে গ্রেপ্তার করে?'

'অমন ব্যাপার আগে ঘটেছে। তবে তা নির্ভর করে অসুস্থতার ওপর।'

'আপনি তো শহরের দিকে যাচ্ছেন। আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন?'

শহরের মাঝামাঝি পৌঁছে কটার্ড-এর অনুরোধে গাড়ি থামাল রিও। পাশে একদল বাচ্চা এক্কা-দোক্কা খেলছিল। ফুটপাথের ওপর

দাঁড়িয়ে কটার্ড প্রশ্ন করল, 'সবাইকে দেখছি মহামারী মহামারী করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তেমন কোন আশঙ্কা আছে?'

'মানুষ সবসময় একটা না একটা হুজুগ নিয়ে থাকতে চায়। এটাই তো স্বাভাবিক।'

'ঠিক বলেছেন। হঠাৎ দশটা লোক মারা গেলে মানুষ ভাবে কেয়ামত এসে গেছে। কিন্তু আমি এখন ওরকম কিছু আশা করি না।'

'তাই! তাহলে কী আশা করেন?'

গাড়ির দরজাটা চেপে ধরল কটার্ড। চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, 'ভূমিকম্প। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাক।'

পরের দিন শহরের এমাথা-ওমাথা ছুটাছুটি করল রিও। কয়েকদিন থেকে নিজের পেশাটা ওর কাছে মনে হচ্ছে এক কঠিন বোঝা। এতদিন দেখেছে, রোগীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের পুরোপুরি ছেড়ে দেয় ওর হাতে। কিন্তু কয়েকদিন থেকে ও উপলব্ধি করছে, ওর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চাইছে ওরা। রোগ আড়াল করতে চাইছে। কেমন একটা আক্রোশ নিয়ে ওরা তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

রাত দশটায় হাঁপানি রোগীর বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল রিও। আজকে এটাই ওর শেষ রোগী। সীট থেকে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলতে রীতিমত বেগ পেতে হলো ওকে।

হাঁপানি রোগী বিছানায় বসে ওর প্রিয় পুরনো খেলাটা খেলছিল; এক পাত্র থেকে তুলে গুনে গুনে অপর পাত্রে রাখছিল শুকনো মটরদানা। রিওকে দেখে চোখ তুলে চাইল সে, আনন্দে ডগমগ করে উঠল ওর মুখ।

'আসুন, ডাক্তার সাহেব। চারদিকে কলেরা শুরু হয়েছে, না?'

'এসব চিন্তা কে ঢোকাল আপনার মাথায়?'

'কেন, কাগজে দেখলাম। রেডিও-তেও শুনেছি।'

'না, কলেরা নয়।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল হাঁপানি বুড়োর চোখমুখ। হেসে বলল, 'কর্তারা তাহলে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।'

'একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না।'

সে রাতে তিরিশজন রোগীর খবর পৌঁছল কর্তৃপক্ষের কাছে। রিওকে টেলিফোন করল ডাক্তার ক্যাসেল।

'রিও, স্পেশাল ওয়ার্ডে কতগুলো বেড আছে?'

'আশিটা।'

'রোগীর সংখ্যাও নিশ্চয়ই তিরিশের বেশি হবে।'

'এখন দুধরনের রোগী। একদল ভুগছে আতঙ্কে। আর অন্য দল আতঙ্কিত হওয়ার আগেই চলে যাচ্ছে কবরস্থানে। এদের সংখ্যাই বেশি।'

'বুঝতে পারছি। কবরস্থানে লাশ পরীক্ষা করে দেখা হয়?'

'না। রিচার্ডকে টেলিফোনে বলেছিলাম শুধু নোটিস এবং ইস্তেহার দিয়ে কোন লাভ হবে না; রোগের বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে; আর নয়তো কিছু না করাই ভাল।'

'ঠিক বলেছ। তো ও কী বলল?'

'বলল ওর করার কিছু নেই। ক্ষমতা নেই। এইসব অজুহাত আরকি। কিন্তু আমার ধারণা, অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে।'

রিও-র কথা বাস্তবে রূপ নিল। তিন দিনে রোগীতে ভরে গেল স্পেশাল ওয়ার্ড। রিচার্ড ওকে জানাল, শিশুদের একটা স্কুল দখল করে সেখানে অস্থায়ী হাসপাতাল খোলার কথাবার্তা চলছে। রিও অপেক্ষা করতে লাগল, প্যারিস থেকে কবে আসবে সিরাম।

বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি আরম্ভ করল ডাক্তার ক্যাসেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাল লাইব্রেরিতে। ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, ইঁদুরগুলো মারা গেছে প্লেগ কিংবা তারই কাছাকাছি কোন রোগে, ফলে লক্ষ লক্ষ মাছির

জন্ম হয়েছে শহরে; এখনি ওগুলোকে ধ্বংস করতে না পারলে জ্যামিতিক হারে বাড়বে প্লেগের জীবাণু।

হু-হু করে বেড়ে চলল প্লেগের শিকার। প্রথম দিন মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ষোলোয়। দ্বিতীয় দিন চব্বিশে। তৃতীয় দিনে আটাশ। এবং চতুর্থ দিনে বত্রিশ। এ-দিনে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হলো, শিশুদের স্কুলটাতে অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়েছে।

প্রিফেক্টকে টেলিফোন করে রিও বলল, 'স্যার, যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাতে কোন লাভ হচ্ছে বলে তো মনে হয় না।'

হ্যাঁ, সাড়া দিলেন প্রিফেক্ট। 'মৃতের সংখ্যা আমি দেখেছি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে অবস্থা উদ্বেগজনক।'

'শুধু উদ্বেগজনক নয়, এতে সবকিছুই বোঝা যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। আমি সরকারকে নির্দেশ দেবার জন্যে অনুরোধ করব।'

রিচার্ড-এর মাধ্যমে রিও-র কাছে অনুরোধ করলেন প্রিফেক্ট, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর একটা বিবরণী তৈরি করতে হবে ওকে; কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে ওটা।

বিবরণী তৈরি করল রিও। ওতে থাকল রোগের বিভিন্ন উপসর্গের বর্ণনা, মৃতের সংখ্যা। সেদিন মারা গিয়েছিল চল্লিশজন। প্রিফেক্ট নিজে সবকিছু তদারকির দায়িত্ব নিলেন।

পরের দিন প্লেনে প্যারিস থেকে এল সিরাম। আপাতত যা এসেছে যথেষ্ট। কিন্তু রোগের প্রকোপ বাড়লে ওতে কুলোবে না। প্যারিসে আবার তার পাঠাল রিও। উত্তর এল, জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় যে মজুদ ছিল তার সবটাই শেষ হয়ে গেছে; নতুন করে তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে ঋতুতে এল পালা বদল। শহরতলি থেকে শহরের দিকে পা বাড়াল বসন্ত। রাস্তার দুপাশে, বাজারে, দেখা দিল ফুল

বিক্রেতারা। ঝুড়িভর্তি শুধু গোলাপ আর গোলাপ। বাতাস ভারি হয়ে উঠল ওদের সুবাসে।

মহামারীর আক্রমণটাও কেমন যেন শিথিল হয়ে এল। কোন দিন মৃতের সংখ্যা নেমে আসে মাত্র দশজনে। আবার কোন দিন লাফ দিয়ে ওঠে অনেক ওপরে। এমনই একদিন, মৃতের সংখ্যা পৌঁছল তিরিশে। সেদিন, রিওকে একটা সরকারি টেলিগ্রাম পড়তে দিলেন প্রিফেক্ট।

টেলিগ্রামে লেখা আছে: 'ঘোষণা করো, শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছে। বন্ধ করে দাও শহরের দরজা।'

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এখন থেকে সবার কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল প্লেগ। এতদিন শহরবাসী ওদের চারপাশে বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখে বিস্ময় বোধ করলেও যতদূর সম্ভব তারই ভেতর নিজেদের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালিয়ে গেছে। কিন্তু শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়ার পর ওদের সম্মুখীন হতে হলো বঞ্চনার। মাত্র কয়েকদিন আগেও পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় ওরা ধরে নিয়েছিল ওদের এই ছাড়াছাড়ি সাময়িক। প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে সামান্য দু-একটা মামুলি কথাবার্তা বলে, একটু চুমু খাওয়াখাওয়ি করে বিদায় নিয়েছে ওরা, ধরে নিয়েছিল মাত্র কয়েকদিন পরেই আবার দেখা হবে ওদের। এখন হঠাৎ দেখল, বড় অসহায়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সবাই।

লোকজন ব্যাপারটা বোঝার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্ধ করে দেয়া হয় শহরের ফটক, তাই ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করার কোন অবকাশই পায়নি কেউ। ফলে ওরা এমন আচরণ করতে বাধ্য হলো যা থেকে মনে হলো ব্যক্তিগত অনুভূতি বলতে কিছুই নেই ওদের। শহর ছাড়ার আবেদনপত্র নিয়ে প্রিফেক্ট-এর অফিস ঘেরাও করল জনতা। কিন্তু কাউকেই বাইরে যাবার

অনুমতি দেয়া হলো না।

চিঠি লেখার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত করা হলো শহরবাসীকে। কর্তৃপক্ষ মনে করলেন এর ফলে রোগের জীবাণু শহরের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রথমদিকে অন্যান্য শহরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না, কিন্তু এর পরে টেলিফোন কেন্দ্রগুলোতে ভিড় এত বেড়ে গেল যে কয়েক দিনের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হলো এই যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম হলো টেলিগ্রাম। হৃদয়ের গভীর আর্তিগুলো সীমাবদ্ধ হলো কয়েকটি শব্দে: 'তোমার শরীর ভাল,' কিংবা 'সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে, প্রিয়।'

কিছুদিন এভাবে কাটবার পর যখন সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারল, কারুরই আর শহর ছেড়ে বাইরে যাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই, তখন প্রশ্ন উঠল প্লেগ শুরু হওয়ার আগে যারা বাইরে গিয়েছিল তাদের ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হবে কিনা? কিছুদিন আলাপ-আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ জানালেন এই অনুমতি দিতে তাদের আপত্তি নেই। সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন, একবার যারা ফিরে আসবে কোন অবস্থাতেই তাদের আর শহর ছেড়ে যেতে দেয়া হবে না। ইতিমধ্যে প্লেগের কবলে যারা পড়েছিল তারা উপলব্ধি করল এই ব্যবস্থার ফলে পরিবারের লোকদের অকারণে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে টেনে আনা হবে; তাই, অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও, ওদের অনুপস্থিতিকেই মেনে নিল ওরা।

মানুষ হয়ে উঠল সন্দেহপরায়ণ। যে-সব স্বামী এতদিন স্ত্রীর ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে এসেছে, তারাই হঠাৎ নিজের স্ত্রীর ওপর ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। প্রেমিকদের ক্ষেত্রেও ঘটল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

শহরের অধিবাসীরা বন্ধ করে দিল সামাজিক মেলামেশা।

শহরের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর প্রাণহীন রুটিন মেনে চলে, একই রাস্তায় বারবার ঘুরেফিরে বেড়িয়ে, দিনের পর দিন একই অতীত স্মৃতির রোমন্থন করে মিথ্যা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করার ভেতর সীমাবদ্ধ হলো ওদের জীবন।

এভাবে প্লেগ শহরবাসীকে ঠেলে দিল নির্বাসিত জীবনে। সুখের যত স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সবাই। ভাবল, বাইরে ছিল যে প্রিয়জন সে ফিরে এসেছে, এখনই দরজায় বেল বাজবে, একটু পরে সিঁড়িতে শোনা যাবে পরিচিত পায়ের শব্দ। অতীত ছাড়া কিছুই থাকল না ওদের। উদ্দেশ্যহীনভাবে দিন কাটানো এবং নিষ্ফল স্মৃতিচারণ এই দুই অসহায় অবস্থার শিকার হয়ে এক নির্মম সঙ্কটের মধ্যে বাস করতে লাগল ওরা।

দুই

শহরবাসীকে এই আকস্মিক বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ে শহরের ফটকে পাহারাদার হয়ে বসল প্লেগ নিজেই। ফিরিয়ে দিতে লাগল বন্দরে নোঙর করতে আসা বাইরের জাহাজগুলোকে। কোন যানবাহনই আর ভেতরে ঢুকতে পারে না। বুলভার্দের চূড়া থেকে নিচে তাকালে শহরের দৃশ্য অদ্ভুত মনে হয়; মনে হয় শহরের সবগুলো গাড়ি যেন একটানা একটা বৃত্তাকার পথে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। রোগের সংক্রমণ যাতে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে,

তার জন্যে যে কয়েকটা জাহাজ আটকে রাখা হয়েছিল, শুধু সেগুলোকেই চোখে পড়ে সাগরে নোঙর করা অবস্থায়। জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিকট চেহারার ক্রেন, এখানে ওখানে কাত হয়ে পড়ে ছোট বড় ওয়াগন।

ব্যুরো থেকে ঘোষণা করা হলো, প্লেগের আবির্ভাবে তৃতীয় সপ্তাহে শহরে তিনশো দুজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ সপ্তাহ পরে মৃতের সংখ্যা দেখা গেল তিনশো একুশ। ছ'সপ্তাহ পরে তা উঠল তিনশো পঁয়তাল্লিশে।

যানবাহন চলাচল এবং খাদ্য সবরাহের নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রিফেক্ট কিছু ব্যবস্থা চালু করলেন। রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলো পেট্রল; খাদ্যবস্তুর বিক্রয়ের ওপরও আরোপিত হলো নিয়ন্ত্রণ। বিদ্যুতের ব্যবহারও চলে এল নিয়ন্ত্রণের আওতায়। শুধুমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোকে ছাড়পত্র দেয়া হলো শহরে ঢোকার। যানবাহন চলাচল দ্রুত হারে হালকা হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছাল যখন শহরের রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ি বলতে কিছুই চোখে পড়ছে না আর।

রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল বিলাসবহুল সামগ্রীর সব দোকান রাস্তাঘাটে পথচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল বহুগুণ। এবং যে সময়ে কাজকর্মের চাপ সাধারণত কম থাকে, সে সময়ে রাস্তাঘাটে এবং কাফেতে প্রচণ্ড ভিড় জমতে লাগল, কারণ দোকানপাট এবং বেশ কিছু সরকারি অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেককেই নিষ্ক্রিয়ভাবে সময় কাটাতে হচ্ছে। এর ফলে লাভবান হলো সিনেমাহলের মালিক এবং মদের ব্যবসায়ীরা। সিনেমা দেখা কিংবা মদ খাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প রইল না শহরবাসীর। যদিও প্রতিটি সিনেমা হলে একই ছবি চলছিল দিনের পর দিন ধরে, তবু দর্শকের ভিড় কমতে দেখা গেল না কোথাও। মদ্যপানের পরিমাণটাও বেড়ে গেল আগের

চেয়ে। এক কাফের মালিক দোকানের সামনে একটা স্লোগান লিখে দিল: 'রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চাইলে প্রয়োজন বড় এক বোতল মদ।'

এখন প্রতিদিনই রাত দুটোর দিকে দেখা যায় বেশ কিছুসংখ্যক মাতাল, বিভিন্ন কাফে থেকে যাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, টলতে টলতে বাড়ির দিকে হাঁটছে আর তারস্বরে চেঁচিয়ে শোনাচ্ছে জীবন সম্পর্কে আশাবাদের কথা।

শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়ার দুদিন পর, ডাক্তার রিও ফিরছে হাসপাতাল থেকে, পথে দেখা হলো কটার্ড-এর সঙ্গে। কটার্ড-এর চেহারা থেকে উপচে পড়ছে খুশি। ওকে সুস্থ দেখে অভিনন্দন জানাল রিও।

'এই যে অভিশপ্ত মহামারী, এ-সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, ডাক্তার সাহেব? ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাই না?' প্রশ্ন করল কটার্ড। ঘাড় নেড়ে ওকে সমর্থন করল রিও।

দুজন একসঙ্গে কিছুটা পথ হাঁটল। এক মুদির গল্প শোনাল কটার্ড। পরে বেশি মুনাফায় বিক্রি করবে বলে প্রচুর টিনজাত খাদ্যসামগ্রী মুজদ করে রেখেছিল লোকটা। কিন্তু ওর সে-আশা পূরণ হয়নি, তার আগেই মারা গেছে হাসপাতালে।

'প্লেগের ছুতোয় কেউ যে কিছু টাকা কামিয়ে নেবে তারও কোন সুযোগ নেই,' মন্তব্য করল কটার্ড।

আরও একজন মানুষের গল্প বলল ও। লোকটার শরীরে তখন এই রোগের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে। দেহে ভীষণ জ্বর। সেই অবস্থায় ও ঘর থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আসে, এবং সেখানে প্রথমেই যে স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পায়, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে থাকে, 'আমাকেও ধরেছে এবার।'

সেদিনই বিকেলে গ্রাঁদ ওর মনের সমস্ত বেদনা প্রকাশ করল রিও-র কাছে। এই প্রথম ডাক্তারের সামনে বেশ কিছুটা প্রগলভ হয়ে উঠল ও। শব্দ চয়নের ব্যাপারে ওর যে অসুবিধা সেটা অবশ্য এখনও আছে, কিন্তু প্রয়োজন মত উপযুক্ত শব্দ ওর মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসতে লাগল। গ্রাঁদ বলল, একেবারে নাবালক বয়সে ও প্রতিবেশী এক দরিদ্র পরিবারের খুব অল্প বয়স্ক এক মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে। মেয়েটির নাম ছিল জেনি। এই বিয়ের জন্যেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিতে বাধ্য হয় ও।

এরপর ওদের জীবনের যা কাহিনী তা অত্যন্ত সরল। সব স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যা ঘটে ওদের ভাগ্যেও তাই ঘটল। বিয়ের পর দুজন পরস্পরকে ভালবাসে, সেই সঙ্গে চলতে থাকে নিয়মিত কাজকর্ম; তারপর কাজের চাপ দিন দিন এতই বাড়তে থাকে যে তখন ভালবাসার অনুভূতি ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল মনের ভেতর। জেনিকেও চাকরি নিতে হলো। অফিসে সারাদিন ধকলজনিত অবসাদের ফলে ক্রমেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে থাকে গ্রাঁদ। স্ত্রীকে শোনানোর মত কথাও আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসে ওর। হঠাৎ একদিন ওকে ছেড়ে চলে গেল জেনি। যাবার সময় একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল ও।

'সত্যিই একদিন গভীরভাবে ভালবাসতাম তোমাকে, কিন্তু এখন নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়, তাই তোমাকে ছেড়ে যাওয়াটা মোটেই সুখের নয়; কিন্তু জীবন যখন আমাকে আবার নতুন করেই আরম্ভ করতে হবে, তখন আর সুখের কথা নাই বা ভাবলাম।'

গ্রাঁদ ওর পকেট থেকে তোয়ালের মত কী একটা বের করে বেশ শব্দ করে তাতে নাক ঝাড়ল। গোঁফজোড়াও ঠিক করে নিল মুছে। নীরবে, একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রিও।

গেট বন্ধ করে দেয়ার সপ্তাহ তিনেক বাদে একদিন সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় রিও লক্ষ করল একজন যুবক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ওর জন্যে।

'আমাকে চিনতে পারছেন তো? এই মহামারী শুরু হওয়ার ঠিক আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার নাম র‍্যাবেয়া,' যুবকটি বলল।

'ও হ্যাঁ। অবশ্যই মনে পড়ছে। আপনার কাগজে লেখা পাঠাবার মত অনেক উপকরণ এখন পেতে পারেন।'

'ঠিক সে-ব্যাপারে আপনার কাছে আসিনি। দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করবেন? আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত।'

রিও বলল, 'শহরের এক ডিসপেনসারিতে আমাকে একটু যেতে হবে। চলুন, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।'

নিগ্রো এলাকার ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। সন্ধ্যা নামছে চারদিকে। এ-সময় শহরটা সাধারণত কোলাহল-মুখর থাকে, কিন্তু আজ অদ্ভুত রকমের শান্ত বলে মনে হচ্ছে। শব্দের মধ্যে ছিল শুধু দূরাগত বিউগলের আওয়াজ, পড়ন্ত সূর্যের সোনা-মাখানো বাতাসে ভেসে আসছে সেই আওয়াজ। সেনাবাহিনী যে তাদের কাজকর্ম নিয়মিত করে যাচ্ছে এই রকম একটা ভাব বাইরে বজায় রাখার চেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। চারপাশে গোলাপী, ফিকে লাল এবং হলুদ দেয়াল। তারই ভেতর দিয়ে সোজা সরু রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ওরা। অবিরাম বকর-বকর করছে র‍্যাবেয়া। মনে হচ্ছে ওর শরীরের সবগুলো স্নায়ু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

র‍্যাবেয়া জানাল, স্ত্রীকে ফেলে এসেছে প্যারিসে ও। যেদিন

থেকে বাইরের সাথে এই শহরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, সেদিনই ও একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল ওকে। তখন ওর ধারণা ছিল শহরের এই অবস্থা খুবই সাময়িক। কিন্তু পরের দিনই ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর ওর মনে হলো, এই বিপর্যস্ত অবস্থা কতদিন চলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং তক্ষুণি ও শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওর পেশাগত মর্যাদার সুবাদে ওপরতলায় এখানে-ওখানে সাড়া দিয়ে প্রিফেক্ট-এর অফিসে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভে সক্ষম হয় ও। র‍্যাঁবেয়া ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বলে ওরাওঁ-এ ওর উপস্থিতি সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। এই শহরের সঙ্গে কোন ব্যাপারেই ওর কোন যোগসূত্র নেই। এ-অবস্থায় নিশ্চয় ও শহর ছেড়ে বাইরে যাবার অনুমতি পাওয়ার আশা করতে পারে। ভদ্রলোক উত্তরে র‍্যাঁবেয়াকে জানান, যদিও তিনি ওর অবস্থা বুঝতে পেরেছেন এবং ওর জন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি বোধ করছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আইনের কোনরকম ব্যতিক্রম ঘটানোর ক্ষমতা তার নেই। শেষে তিনি র‍্যাঁবেয়াকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, যেহেতু ও একজন সাংবাদিক, তাই ওর লেখার উপযোগী চমৎকার চমৎকার উপকরণ ও এখন ওরাওঁ-এ পেতে পারে। এরপর দার্শনিকের মত মন্তব্য করেছিল ও, পৃথিবীতে এমন কিছু কখনও ঘটে না যার কোন শুভ দিক নেই।

ইতিমধ্যে শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। 'ভেবে দেখুন তো, ডাক্তার সাহেব, কী রকম মূর্খের মত কথাবার্তা বলে এরা। কিছুতেই বুঝতে চায় না, শুধুমাত্র সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখার জন্যে পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়নি। বরং একজন নারীকে ভালবাসব, তাকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করব, এজন্যই আমি জন্মেছি। সেটাই তো সঙ্গত, তাই না?'

রিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জবাব দিল, 'আপনি যে-সব কথা-

বার্তা বলছেন তার মধ্যে ভেবে দেখবার মত নিশ্চয় কিছু থাকতে পারে।'

শহরের প্রধান বুলভার্দে সবসময় যেমন জনসমাগম দেখা যায়, আজ তার কিছুই চোখে পড়ল না। রিও ভাবল, র‍্যান্সডক ব্যুরো থেকে সর্বশেষ যে ঘোষণাটা দেয়া হয়েছে এটা হয়তো তারই ফল। মৃত্যের সংখ্যা ঘোষণার দিনটাতে সবাই কেমন সন্ত্রস্ত থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাবার পর শহরের অধিবাসীরা আবার সহজ এবং আশান্বিত বোধ করতে শুরু করে।

'সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পরিচয় খুবই অল্প দিনের,' র‍্যাবেয়া আবার কথা আরম্ভ করল, 'কিন্তু আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।' কোন সাড়াশব্দ দিল না রিও। 'বুঝেছি, আপনি খুব বিরক্ত বোধ করছেন। সত্যি, আমি দুঃখিত। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম, এই অশিপ্ত রোগটা আমার দেহে সংক্রমিত হয়নি, এই বলে আপনি আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে পারেন কি না। তাতে আমার যাওয়ার ব্যাপারটা একটু সহজ হত।'

মাথা নাড়ল রিও। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ওর পায়ের ওপর ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ও উবু হয়ে ছেলেটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল রাস্তার ওপর। হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌছল প্যালেস দ্য আর্মস-এর কাছে। শাখা-প্রশাখা এলিয়ে দিয়ে স্ট্যাচু অভ রিপাবলিকের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে ধুলিধূসর উইলো আর ডুমুর গাছের সারি। র‍্যাবেয়া-র চেহারার মধ্যে কেমন একটা অপ্রসন্ন এবং কঠিন একগুঁয়ে ভাব ফুটে উঠল।

'আমি আপনার অবস্থা বুঝিনি, এমন সন্দেহ করবেন না,' বলল রিও, 'কিন্তু আপনি যে যুক্তিগুলো দেখাতে চাইছেন সেগুলো শেষ পর্যন্ত টেকানো শক্ত। আমি যদি আপনাকে সার্টিফিকেট দেই

তাতেও আপনার কোন লাভ হবে না।'

'কেন?'

'কারণ, এই শহরে আরও হাজার হাজার লোক রয়েছে যাদের অবস্থা আপনারই মত, কিন্তু তাদের সবাইকে তো আর শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়।'

'তাদের দেহে প্লেগের জীবাণু সংক্রমিত হয়নি, তা জানা সত্ত্বেও তাদের শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেয়া সম্ভব হবে না বলে আপনি মনে করেন?'

'দেখুন, রোগ সংক্রমিত হয়নি এটা জানাই তো তাদের শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়।'

'কিন্তু আমি এই শহরের অধিবাসী নই।'

'দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এখন থেকে নিজেকে আপনার এই শহরের একজন বলেই মনে করতে হবে।'

এবার গলার স্বর একটু চড়িয়ে দিল র‍্যাঁবেয়া। 'গোল্লায় যাক। কিন্তু, ডাক্তার, আপনি কি বোঝেন না এটা মানুষের সাধারণ অনুভূতির ব্যাপার? বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কি আপনি অনুভব করেন না?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রিও। তারপর বলল, 'আমি সবকিছুই অনুভব করি। আমি চাই সবাই আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাক। কিন্তু আইন আইনই। শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছে, তাই এ-ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী আমার যা কর্তব্য আমাকে তা করতেই হবে।'

'না, আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছুই বোঝেন না,' তিক্ততার সঙ্গে বলল র‍্যাঁবেয়া, 'কারণ আপনি যেসব কথা বলছেন সেগুলো যুক্তির কথা, বুদ্ধি বিবেচনার কথা, হৃদয়ের কথা নয়। আপনি বাস করেন বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক কল্পনার রাজ্যে।'

স্ট্যাচু অভ রিপাবলিকের দিকে চোখ তুলে রিও বলল, 'আমি বাস্তব নিয়ে কথা বলছি।'

র‍্যাবেয়া ওর টাই সোজা করতে করতে বলল, 'অর্থাৎ আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্যের আশা করা আমার উচিত হবে না, এই তো? কিন্তু জেনে রাখুন, এ-শহর ছেড়ে আমি যাবই।'

রিও আবারও বলল, 'আমি সব জানি এবং বুঝি। কিন্তু আমার করার কিছুই নেই।'

'মাফ করবেন। শুনেছি এটা আপনারই কাজ,' র‍্যাবেয়ার গলার স্বর আবার চড়ল, 'শুনেছি যে-নির্দেশ জারি করা হয়েছে তার খসড়া আপনারই দেয়া। ভেবেছিলাম, যে-আইন তৈরি করতে আপনি সাহায্য করেছেন, অন্তত একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তা ভঙ্গ করার ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পাব। কিন্তু আমার কথার কোন গুরুত্বই দিলেন না আপনি। বিচ্ছেদের বেদনা যে কী তা অনুভব করার কোন চেষ্টাই করছেন না আপনি।'

রিও স্বীকার করল, র‍্যাবেয়ার অভিযোগ কিছুটা সত্যি। তবে এসব কথা চিন্তা না করাই ও এখন শ্রেয় বলে মনে করে।

ঝাঁজাল কণ্ঠে র‍্যাবেয়া বলল, 'এরপর নিশ্চয় জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের দৃষ্টান্ত দেবেন। কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণ আমাদের সবার কল্যাণের যোগফল।'

এতক্ষণ পর হঠাৎ যেন একটা স্বপ্নের ভেতর থেকে জেগে উঠল রিও। 'বেশ, বেশ। একটু হাঁটুন দেখি। কথাটা ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু ভাববার আছে,' বলল ও। 'কিন্তু আপনি রাগ করছেন কেন? আপনি এ-শহর থেকে মুক্তি পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। তবে সরকারি দায়িত্বের খাতিরে অনেক জিনিস আমি করে উঠতে পারছিনে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে র‍্যাবেয়া বলল, 'ধন্যবাদ। আসলে এতটা বিরক্তি

দেখানো আমার ভুল হয়েছে। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, কিছু মনে করবেন না।'

'আপনার পরিকল্পনার কাজ কেমন চলছে? আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না, আশা করি কিছু মনে করবেন না। তবে আমার বিশ্বাস এমন কিছু ব্যাপার আছে যেখানে আমরা দুজনে একমত হতে পারব।'

হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল র‍্যাঁবেয়া। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'হ্যাঁ, আমারও সেই রকম মনে হয়।' এরপর মাথার টুপিটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তার ওপাশে চলে গেল। রিও দেখল, যে-হোটেলে জাঁ তারিউ থাকে সেটাতেই ঢুকল ও।

মাথাটা সামান্য একটু নড়ল রিও-র। মনের ভেতর জেগে উঠল প্রশ্ন। নিজের সুখভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে অস্বীকার করে ঠিকই করেছে র‍্যাঁবেয়া। কিন্তু ও যে রিওকে দোষারোপ করেছে অবাস্তব চিন্তার মানুষ বলে, এটা কি ঠিক? শহরে প্লেগ এখন নিয়মিতভাবে তার পেট ভর্তি করে স্ফীত হচ্ছে, তার শিকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সপ্তাহে পাঁচশো। ওকে দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছে হাসপাতালে, এটা কি অবাস্তব? একটা অস্থায়ী হাসপাতাল পরিচালনা করতে হচ্ছে ওকে, হাসপাতালটার সব দায়িত্ব ওর। এ-রকম তিনটে হাসপাতাল আছে ওর তত্ত্বাবধানে, এটা কি খুব সহজ দায়িত্ব?

হাসপাতালের একটা ঘর, সুন্দর করে গুছিয়ে যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে রিওকে। ঘরের মেঝেটো সম্পূর্ণ ঝেড়ে-মুছে পানি আর ক্রিসটালিক অ্যাসিড দিয়ে বানানো হয়েছে একটা ছোট্ট হ্রদ। ওই হ্রদের মাঝখানে ইট দিয়ে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ। রোগী হাসপাতালে এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাকে

তোলা হয় ওই দ্বীপের ওপর। তার পরনের কাপড় দ্রুত ছাড়িয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হয় চারপাশের রোগজীবাণুনাশক পানির মধ্যে। তারপর রোগীর দেহ পরিষ্কার করে ধুয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে, হাসপাতালের পোশাক পরিয়ে রিও-র কাছে নিয়ে যাওয়া হয় পরীক্ষার জন্যে; সেখান থেকে তাকে পৌঁছে দেয়া হয় তার নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে।

রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো থেকে শুরু করে সব কাজ নিজে তদারক করে রিও। সিরাম ইনজেকশন দিয়ে, দেহের স্ফীতিগুলো চিরে চিরে তা থেকে পুঁজ বের করে। রোগীর সংখ্যা গুনে মিলিয়ে নেয় ও, এবং বিকেলে আবার আসে তাদের অবস্থা দেখার জন্যে। রাত নামতে না নামতেই বেরিয়ে পড়ে বাসায় বাসায় রোগী দেখতে। রোগীকে পরীক্ষার পর যদি দেখা যায় রোগ সংক্রমিত হয়েছে তাহলে তক্ষুণি তাকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। এরপর শুরু হয় রোগীর পরিবারে ধস্তাধস্তির পালা। কেননা সবাই জানে রোগী একবার হাসপাতালে গেলে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কেউই তার মুখ দেখতে পাবে না।

'একটু দয়ামায়া তো আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি, ডাক্তার,' এই বলে অনুনয় করে রোগীর মা-রা। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় না। যদিও করুণা সে অবশ্যই বোধ করে।

হাসপাতালে টেলিফোন করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না ওর। এরপর শব্দ শোনা যায় অ্যাম্বুলেন্সের। প্রথম প্রথম অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ পেলে প্রতিবেশীরা জানালা খুলে চেয়ে চেয়ে দেখত, কিন্তু ইদানীং ওই শব্দ শুনতে পেলেই দ্রুত জানালা বন্ধ করে দেয় সব্বাই। তারপর শুরু হয় রোগীকে নিয়ে বিরোধ, অশ্রুবর্ষণ আর কাকুতিমিনতির পালা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগীকে যেতেই হয় হাসপাতালে। তারপর বিদায় নেয় রিও।

প্রথম দিকে হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে টেলিফোন করে দিয়েই অন্য রোগী দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ত ও, অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অপেক্ষা করত না। এতে পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠছিল। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর আত্মীয়স্বজনরা তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দিত বাড়ির দরজা, যেন অ্যাম্বুলেন্স এসে রোগীকে নিয়ে যেতে না পারে। তারপর শুরু হত দরজার ওপর প্রবল আঘাত। কান্নাকাটি। পুলিসের আগমন। এবং শেষে সৈনিকের আবির্ভাব। সবরকমের বাধা তছনছ করে রোগীকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হত হাসপাতালে। এখন প্রত্যেক ডাক্তারের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে একজন পুলিস অফিসারও রোগীর বাসায় আসছে। ফলে এখন আর অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না রিওকে। একজনকে দেখেই অন্য রোগীর বাসায় চলে যায় ও।

এ-ভাবে কেটে গেল একটার পর একটা অবসাদময় সপ্তাহ। পার হলো সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা। উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবন কাটাতে লাগল শহরের অধিবাসীরা। মানুষ বুঝল দয়ামায়া শব্দগুলো অর্থহীন। হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করা নিরর্থক। এক ধরনের নির্লিপ্ততা আচ্ছন্ন করে ফেলল ওদের চেতনাকে।

তিন

প্রথম মাসের শেষের দিকে চার্চ কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন প্লেগের বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম আরম্ভ করবেন তাঁরা। এই উপলক্ষে

জনসাধারণকে ধর্মীয়বাণী শোনাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো ফাদার প্যানালুকে। আয়োজন করা হলো একটা প্রার্থনা সপ্তাহ-এর।

প্রথম দু'তিন দিন অনেকেই দাঁড়িয়ে রইল গির্জার বারান্দার বাইরে। অপেক্ষা করল বারান্দার সামনের পথে, ডালিম গাছের তলায়। দূর থেকে শুনল গির্জার ভেতর মিলিত কণ্ঠের প্রার্থনা। এরপর দেখতে দেখতে সবাই ঢুকতে শুরু করল গির্জার ভেতর। কণ্ঠ মেলাতে লাগল প্রার্থনা এবং আহ্বানে।

রোববারে, ফাদার প্যানালুর বাণী শোনার সময় দেখা গেল উপাসনাকারীরা গির্জার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আশেপাশের সমস্ত সংলগ্ন স্থান ভরে ফেলেছে। আগের দিন থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সেদিন সকাল থেকে আরম্ভ হলো প্রবল বর্ষণ। যারা গির্জার বাইরে দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই মাথার উপর মেলে ধরল ছাতা। গির্জার ভেতরটা ভরে উঠল ধূপের মৃদু সুবাস এবং ভেজা জামাকাপড়ের গন্ধে। মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার প্যানালু।

উদাত্ত কণ্ঠে বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন তিনি: 'ভায়েরা, এক কঠিন বিপদ নেমে এসেছে আপনাদের ওপর। কিন্তু, ভায়েরা, এই বিপর্যয় আপনাদেরই কৃতকর্মের প্রতিফল। ইতিহাসে যখন এই বিপর্যয়ের আবির্ভাব হয়, তখন একে ব্যবহার করা হয়েছিল আঘাত হানার অস্ত্র হিসেবে। ফেরাউন স্রষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল, তাই প্লেগের বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার ওপর; যেন সে স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে অনুনয় জানাতে বাধ্য হয়।

'এ-ভাবে সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে যারা স্রষ্টার আদেশ এবং নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে তাদের অপমান করার জন্যে, তাদের দর্পচূর্ণ করার জন্যে স্রষ্টার অভিশাপ হিসেবে পাঠানো হয়েছে প্লেগকে। বন্ধুগণ, আপনারা গভীরভাবে এ-বিষয়টি চিন্তা

করুন, এবং আসুন আমরা নতজানু হয়ে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করি।'

ইতিমধ্যে বাইরে শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত, গির্জার পুবদিকে জানালার ওপর অবিরাম বর্ষণের ফলে চারপাশের স্তব্ধতা হয়ে উঠেছে আরও গভীর এবং আরও প্রকট।

'আমাদের ভেবে দেখতে হবে কেন আবির্ভাব হয়েছে প্লেগের? যারা ন্যায় এবং সত্যের পথে চলেন, তাদের শঙ্কিত হবার কিছু নেই। যারা অন্যায় এবং অবৈধ কাজে লিপ্ত, তাদের হৃদয় এখন কাঁপবেই। আপনাদের মনে রাখতে হবে, সমগ্র পৃথিবীটা স্রষ্টার কাছে একটা শস্য মাড়াইয়ের বিরাট খামার, আর এই প্লেগ হচ্ছে সে শস্য মাড়াইয়ের দণ্ড। যতদিন না তিনি শস্য ঝেড়ে আবর্জনামুক্ত করতে পারছেন, ততদিন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলবে এই দণ্ডমাড়াইয়ের কাজ। দীর্ঘদিন ধরে আমরা অন্যায় এবং অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি, দীর্ঘদিন ধরে আমরা নির্ভর করে এসেছি স্রষ্টার অপার করুণা এবং তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ক্ষমার ওপর। ভেবেছি অনুশোচনা করলেই সবকিছু পাওয়া যাবে। আমাদের ভেতর বিধি-নিষেধ বলে কিছু নেই। আমরা সবাই একটা তৃপ্তিদায়ক নিশ্চিত আশ্বাসের মধ্যে বসবাস করছি।

'দীর্ঘদিন ধরে অপার করুণার দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থেকেছেন এই শহরের দিকে। কিন্তু কতদিন আর তিনি অপেক্ষা করতে পারেন? তাঁর যে-চিরন্তন আশা, তা আমরা দীর্ঘদিন ধরে পূরণ হতে দেইনি; তারই ফলে আজ তিনি ভয়ঙ্কর রুষ্ট হয়েছেন।'

অশান্ত ঘোড়া অনেকক্ষণ ধরে বাঁধা থাকলে যেমন থেকে থেকে নাক দিয়ে শব্দ করে, সমবেত উপাসনাকারীদের ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন তেমনি একটা ছোট্ট শব্দ করে উঠল। এদিক ওদিক চেয়ে ক্ষণিকের বিরতি দিলেন ফাদার প্যানালু। তারপর কিছুটা

নিম্নস্বরে আবার শুরু করলেন ধর্মকথা।

'রাজা আর্মবার্টোর আমলে সারা ইতালি জুড়ে এক ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তার নিষ্ঠুরতম ধ্বংসলীলা চলেছিল রোম এবং প্যাভিয়ায়। লাশ কবরস্থ করার মত যথেষ্ট লোক আর জীবিত ছিল না তখন। এমন সময় সেখানে নেমে আসে দুজন স্বর্গীয় দূত। একজন সৎ, অন্যজন অসৎ। সৎ প্রকৃতির দূতটা বিভিন্ন বাড়িতে আঘাত হানার আদেশ করত অসৎ প্রকৃতির দূতটাকে। অসৎ দূতটার হাতে থাকত মস্ত বড় এক বর্শা। সে ওর ওই বর্শা দিয়ে একটা বাড়িতে যতবার আঘাত হানত, সে-বাড়ি থেকে ঠিক ততটা লাশ আপনা-আপনি অদৃশ্য হয়ে যেত।'

এই পর্যায়ে ফাদার প্যানালু তাঁর ছোট হাত দুখানা প্রসারিত করলেন খোলা বারান্দার দিকে। বাইরের অঝোর বৃষ্টির আড়ালে কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করলেন যেন। তারপর উচ্চস্বরে খেই ধরলেন: 'ভায়েরা, সেই ভয়াবহ শিকার শুরু হয়েছে আবার। শহরের পথে পথে ছড়িয়ে আছে তারই ধ্বংসলীলা। ওই দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহামারীর স্বর্গীয় দূত, লুসিকারের দেহকান্তি, সাক্ষাৎ শয়তান যেন। আপনাদেরই বাড়ির ছাদের ওপর ঘুরছে সে। তাঁর দক্ষিণ হাতে প্রকাণ্ড এক বর্শা, যে-কোন মুহূর্তে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত। হয়তো এ-মুহূর্তে আপনাদের কারও দরজার দিকেই চেয়ে রয়েছে তার আঙুল, লাল বর্শাটা ভেঙে ফেলেছে কবাট, আর বাঁ হাতটা বাড়িয়ে রেখেছে অন্য কারও বাড়ির দিকে। আর প্লেগ এতক্ষণে আপনার শোবার ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করছে আপনার যেবার।'

এরপর ফাদার প্যানালুর বক্তৃতা হয়ে উঠল উচ্ছল, আবেগময়। 'কল্পনা করুন, বিরাট আকারের একটা কাঠের দণ্ড যেন সারাক্ষণ এই শহরের ওপর বনবন ঘুরছে, সামনে যা-কিছু পাচ্ছে

এলোপাতাড়ি আঘাত হানছে তাতে। আবার ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে সেই দণ্ড, আর বৃষ্টির ধারার মত তার গা থেকে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ছে শোণিতের ধারা।'

একটানা দীর্ঘ বক্তৃতার পর কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন ফাদার প্যানালু। মাথার চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়েছে কপালের ওপর, সারা শরীর কাঁপছে থরথর; আর তাঁর হাত বেয়ে সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ছে মঞ্চ অবধি। আবার যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তিনি, তখন দেখা গেল অনেক খাদে নেমে গেছে তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু আগের মতই কাঁপছে অভিযোগের আবেগে।

'দেখুন, নিজেদের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে আমাদের সামনে। আমরা বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি যদি রবিবারে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা-সভায় যোগ দেই, তাহলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর জন্যে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত, যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করতে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু স্রষ্টা এ-ধরনের উপহাসের পাত্র নন। তিনি আরও ঘন ঘন এবং আরও দীর্ঘ সময় ধরে কাছে পেতে চান আমাদের। এটাই তাঁর ভালবাসার ধরন।'

বাইরে থেকে আর্দ্র বাতাসের একটা ঝাপটা এসে ঢুকল গির্জার ভেতর। নুয়ে পড়ল বাতির শিখাগুলো, কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। মোম পোড়ার ঝাঁঝাল গন্ধ, কাশি ও চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসছে এক সঙ্গে। ফাদার প্যানালু আবার ফিরে এলেন তাঁর বক্তৃতায়।

'আমার লক্ষ্য, আপনাদের সত্যের পথে নিয়ে যাওয়া। কিভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টির মহা আনন্দে শরিক হতে হয় আমি সবাইকে সেটাই শেখাতে চাই। কয়েকশো বছর আগে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা একবার এই প্লেগের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল বিধি-নির্দেশিত পথ। যাদের প্লেগে ধরেনি এমন বহু মানুষ তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করার

জন্যে যে বিছানায় প্লেগের রোগী মারা গেছে তা থেকে চাদর তুলে নিয়ে নিজেদের শরীরে জড়িয়েছে। এটা বাড়াবাড়ি, ধৃষ্টতা, নিন্দনীয়। কোন কিছুর জন্যে স্রষ্টাকে বাধ্য করতে চাওয়া সঙ্গত নয়।'

গির্জার ভেতর সবাই ভাবল ফাদার প্যানালুর উপদেশ বোধহয় এখানেই শেষ। বাইরে ইতিমধ্যে থেমে গেছে বৃষ্টি। হলুদ দেখাচ্ছে গির্জার সবক'টা বাগান। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কথা-বার্তার আওয়াজ, গাড়ি চলার চাপা গুঞ্জন। উপাসনাকারীরা খুব সাবধানে গুছিয়ে নিচ্ছে নিজেদের জিনিসপত্র। কিন্তু ফাদার প্যানালুর বলা তখনও শেষ হয়নি।

'আমি আশা করি বর্তমান দুর্যোগের এই বিভীষিকা, এবং লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাকাতর মানুষের করুণ আর্তনাদ সত্ত্বেও আপনারা সবাই মিলিতভাবে স্রষ্টার কাছে হাত তুলে একবার প্রার্থনা জানাবেন। আর এরপরের যা কিছু তা স্থির করার সব দায়িত্ব স্রষ্টার নিজের।'

চার

যে রবিবারে ফাদার প্যানালু তাঁর উপদেশবাণী শোনালেন সেদিন থেকেই শহরের সবখানে একটা বড় রকমের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই বলল, একটা সম্পূর্ণ অজানা অপরাধের কারণে অনির্দিষ্ট

কালের জন্যে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

একদিন শহরতলিতে রোগী দেখতে যাচ্ছে রিও। গ্রাঁদও আছে ওর সঙ্গে। দু'জন কথা বলতে বলতে হাঁটছে, এমন সময় অন্ধকারের ভেতর একজন মানুষের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রিও। লোকটা ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডানে আর একবার বাঁয়ে ঝুঁকে পড়ছে, কিন্তু সামনে এগুনোর কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ওর মধ্যে। ঠিক তখুনি জ্বলে উঠল রাস্তার আলো। ওরা দেখল, লোকটার চোখ বন্ধ, আর মুখ বুজে হাসছে নিঃশব্দে। মুখের ভঙ্গিটাও কেমন বিকৃত। দু'পাশ দিয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম।

'আরে, এ যে দেখছি একটা বদ্ধ পাগল, ছাড়া পেল কিভাবে?' মন্তব্য করল গ্রাঁদ।

গ্রাঁদ-এর একটা হাত চেপে ধরে ওকে সামনের দিকে ঠেলার সময় রিও দেখল থরথর করে কাঁপছে কেরানির শরীর।

'আর কিছুদিন এমন চললে সারা শহরটাই পরিণত হবে পাগলা গারদে,' মন্তব্য করল রিও। অনুভব করল ওর শরীরও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, শুকিয়ে আসছে গলার ভেতরটা।

গ্রাঁদ বলল, 'চলুন, কোথাও কিছু একটা খাই।'

একটা কাফেয় ঢুকল ওরা দুজনে। যে জায়গায় মদ বিক্রি হয় শুধু সেই কাউন্টারে বাতি জ্বলছে একটা। ঘরের ভেতর বাতাস ভারি, দম আটকে আসার মত অবস্থা। আশেপাশের সবাই কথা বলছে চাপাস্বরে।

গ্রাঁদ ঢুকেই ফরমাশ দিল মদের, এবং একচুমুকে খালি করে ফেলল পেয়ালা। দেখে অবাক হয়ে গেল রিও। 'যেদিক দিয়ে যায়, একেবারে আগুনের মত জ্বলতে থাকে,' মন্তব্য করল গ্রাঁদ। কিন্তু কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই বাইরে যাবার জন্যে রিওকে

তাগাদা দিতে লাগল ও।

রাস্তায় নেমে চারদিকের অন্ধকারের ভেতর কেমন একটা অদ্ভুত ফিসফিসানির শব্দ শুনতে পেল রিও। রাস্তার আলোর সংক্ষিপ্ত সীমানার ওপরে যে অথৈ অন্ধকার তার ভেতর থেকে ভেসে আসছে শাঁ শাঁ শব্দ। ফাদার প্যানালু যে শস্য মাড়াইয়ের দণ্ডের কথা বলেছিলেন, হঠাৎ রিও-র মনে পড়ল সেটার কথা। চারদিকের ওই শূন্য অন্ধকারের মাঝে যেন অবিরাম কাজ করে চলেছে সেই অদৃশ্য দণ্ডটি। এই ভীতিজনক পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে রিও গ্রাঁদ-এর কাছে জানতে চাইল ওর লেখা কতদূর এগিয়েছে।

'হ্যাঁ। নিশ্চয় কিছুটা এগিয়েছি বলতেই হবে।'

'এখনও তাহলে অনেক কিছু বাকি আছে?'

'তা এখন কিভাবে বলব, বলুন। তবে, ডাক্তার সাহেব, লেখাটাই কিন্তু আসল জিনিস নয়।'

চারপাশের অন্ধকার এখন বেশ গভীর হয়ে এসেছে। কাছের কিছুও দেখার উপায় নেই। তবু রিও অনুভব করল, কথা বলার সময় গ্রাঁদ ওর হাত দুটি খুব সজোরে নাড়ছে। মনে হলো ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লোকটা। কথাগুলো যেন ঠেলাঠেলি করে একসঙ্গে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'আমার এখন একটাই আকাঙ্ক্ষা; আমি যেদিন আমার পাণ্ডুলিপি শেষ করে কোন প্রকাশকের হাতে দেব, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পড়া শেষ করে তাঁর কর্মচারীকে বলবে আপনারা সবাই টুপি খুলে ওকে সম্মান দেখান।'

কথাটা শুনে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল রিও। দেখল, গ্রাঁদ সত্যি সত্যি ওর টুপি খুলে অদৃশ্য কাউকে সালাম দিচ্ছে। অন্ধকারের ভেতর আকস্মিকভাবে বেড়ে গেল হিসহিস শব্দ।

'এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কাজটা কতখানি নিখুঁত হওয়া

দরকার,' বলল গ্রাঁদ।

সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই রিও-র। তাই নীরব থাকাই সমীচীন মনে করল ও। মাথার ভেতর তখনও ওর ফিসফিস করছে ওই অদ্ভুত ভীতিজনক শব্দটা। ইতিমধ্যে গ্রাঁদ-এর মহল্লায় পৌঁছে গেছে ওরা। জায়গাটা যেহেতু রাস্তা থেকে সামান্য একটু উঁচুতে, গালে হিমেল হাওয়ার পরশ পেল ওরা, আবার সেই সঙ্গে টের পেল বাতাসের ধাক্কায় শহরের কোলাহল হারিয়ে যাচ্ছে দূরে।

এখনও আপন মনে বসে যাচ্ছে গ্রাঁদ। কিন্তু কোন কথাই কানে ঢুকছে না রিও-র।

'শুধুমাত্র একটা উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্যে গোটা একটা সন্ধ্যা, কখনও কখনও গোটা সপ্তাহই কেটে যায়, তাহলেই বুঝুন ব্যাপারটা।'

'আচ্ছা, এতক্ষণে বুঝলাম আপনার কথা,' বলল রিও।

বাসার কাছাকাছি পৌঁছে গ্রাঁদ বলল, 'অনুগ্রহ করে আমার বাসায় যদি আসেন, খুব খুশি হতাম।'

খাবার ঘরে ঢুকল ওরা দুজন। টেবিলের পাশে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল গ্রাঁদ। সারা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য কাগজ।

'বসুন এবার, পড়ে শোনান দেখি কী লিখছেন।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল গ্রাঁদ। তারপর ঝপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

নিচের রাস্তা থেকে একটা অদ্ভুত ভন ভন শব্দ উঠে আসছে ওপরে। মনে হচ্ছে যেন প্লেগের শোঁ শোঁ শব্দের জবাব ওটা। পড়তে আরম্ভ করল গ্রাঁদ: 'মে মাসের এক সুন্দর প্রভাতে অনেককেই হয়তো রুচিসম্পন্না এক যুবতী অশ্বারোহিণীকে পাটল

রঙের সুন্দর একটি মাদি ঘোড়ায় চড়ে দুপাশে পুষ্পিত বৃক্ষ ঘেরা বল্‌গনা অ্যাভিন্যু ধরে যেতে দেখে থাকবেন।'

থামল গ্রাঁদ। নিচের যন্ত্রণাকাতর অসহায় শহর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কোলাহল। রিও-র দিকে মুখ তুলল ও।

'কেমন হয়েছে?'

'রীতিমত কৌতূহল জাগছে। শেষে কী হবে সেটা জানার তাগিদ অনুভব করছি।'

শুনে, টেবিলের ওপর থাপ্পড় মেরে গ্রাঁদ বলল, 'আপনি কিস্যু বোঝেননি। এটা একটা যেমন-তেমন খসড়া। আমি যে মোহময় বিভ্রম সৃষ্টি করতে চাইছি, সে পর্যায়ে যেতে হলে এখনও অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

রিও দেখতে পেল, জানালার নিচে, রাস্তায় লোকজন ছুটোছুটি করছে। দ্রুত সিঁড়ির বেয়ে পথে নেমে এল ও। হঠাৎ দুজন মানুষ ওর গায়ে ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগল। মনে হলো শহরের কোন না কোন ফটকের দিকে ছুটছে ওরা।

প্রায় প্রতি রাতেই ইদানীং এমন ঘটনা ঘটছে। অনেকেই চেষ্টা করছে ফটকের দারোয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে। এখানে-ওখানে হচ্ছে মারামারি, হাতাহাতি। একদিকে নিদারুণ গরম, অন্যদিকে প্লেগের নানা বিপর্যয়—এসব দেখতে দেখতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে শহরবাসীর।

পাঁচ

আরও অনেকের মত এ-শহরের আতঙ্ক থেকে পালাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে র‍্যাঁবেয়া। দিনের পর দিন বিভিন্ন অফিসে ধরনা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। অবশ্য এর ফলে একটা লাভ হয়েছে ওর; সময়টা কেটে যাচ্ছে, তাই সাময়িকভাবে হলেও সংকটের চিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে রাখতে পারছে ও।

এর মাঝেই হঠাৎ একদিন আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেল ও। প্রিফেক্ট-এর অফিস থেকে একটা ছাপানো ফরম এল ওর কাছে। নিজের পরিচয়, আর আয়ের বর্তমান এবং অতীত উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফরমের শূন্য ঘরগুলো পূরণ করে দিতে হবে। কিন্তু অনুসন্ধান করে র‍্যাঁবেয়া জানতে পারল এর সঙ্গে ওর শহর ছেড়ে যাবার কোন সম্পর্ক নেই। এই ফরমের উদ্দেশ্য আলাদা। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে খবর দেয়া এবং হাসপাতালে তার চিকিৎসার খরচ মিউনিসিপ্যালিটি না তার আত্মীয়স্বজন বহন করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে এই ফরম পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

কিছুই করার থাকল না র‍্যাঁবেয়ার, ঢুঁ মেরে বেড়াতে লাগল এক কাফে থেকে আরেক কাফেয়। সকালবেলায় বারান্দায় বসে দৈনিক কাগজের পাতা উল্টায়। মনে মনে আশা করে এমন কোন ইঙ্গিত

খুঁজে পাবে যা থেকে মনে হবে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে সঙ্কট। কখনও কখনও দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে পথচারীদের মুখ দেখে। কিন্তু একটানা বিষণ্ন চেহারা দেখে দেখে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয় সে। এরপর দোকানের সাইনবোর্ড এবং বিজ্ঞপ্তিগুলো পড়া শেষ করে নেমে পড়ে শূন্য রাস্তায়। এ-ভাবে দুপুরের রোদে নির্জন রাস্তায় ঘোরা তার কোন কাপে বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুঁ দেয়, এইভাবে সময় কাটিয়ে দেয় সন্ধ্যে পর্যন্ত।

একদিন সন্ধ্যায়, রিও ওকে এক কাফের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখল, যেন ঢুকবে কিনা সে ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছে না। অবশেষে ভেতরে ঢুকে পিছন দিকের একটা টেবিলে বসল ও। তখন ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার ধূসরতা; দেয়ালের আয়নাগুলোয় কাঁপছে অস্তাচলগামী সূর্যের লালিমা; ঘনায়মান অন্ধকারে ঝকঝক করছে শ্বেতপাথরের টেবিলগুলো। নির্জন ঘরে ছায়ার মত বিষণ্ন হয়ে বসে রইল র‍্যাঁবেয়া। দুশ্চিন্তায় মুখখানা করুণ দেখাচ্ছে। রিও ভাবল, এইসব মুহূর্তে নিশ্চয় ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করে ও।

কখনও কখনও এ-সময়টায় স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করে র‍্যাঁবেয়া। বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দেয় ট্রেনের টাইম টেবিল, প্ল্যাটফর্মের ওপর থুতু ফেলা নিষেধ এবং যাত্রীসাধারণের চলাফেরা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ পড়ে পড়ে। এগুলো পড়া শেষ হলে ওয়েটিং রুমে নির্বিকারভাবে বসে থাকে ও। ওই কামরার ঠিক মাঝখানে, একটা লোহার পুরানো স্টোভ রয়েছে। বেশ কয়েক মাস ওতে আগুন জ্বলেনি, গায়ে চায়ের ছোপ ছোপ দাগ। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে রঙ-চঙে পোস্টার, তাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ক্যানেস বা ব্যান্ডলে অবসর কাটানোর।

ওয়েটিং রুমের নির্জন কোণে বসে এক ধরনের স্বাধীনতার স্বাদ

উপভোগ করে র‍্যাবেয়া। ওর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে প্যারিসের পুরানো জীবনের কথা। আগে কখনও র‍্যাবেয়া অনুভব করেনি ওই জীবনকে সে কত ভালবাসে।

ছয়

ফাদার প্যানালু বক্তৃতা দেয়ার পরদিন থেকেই শহরে আরম্ভ হলো উৎকট গরম। সূর্য যেন উঠে এল বাড়িঘরের মাথার ওপর, আর সেখান থেকে ছাড়াতে লাগল আগুনের হল্কা। একদিন সারাক্ষণ বইল লু হাওয়া। শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে উঠল শহরের সব দেয়াল। একমাত্র বাড়ির ভেতরে ছাড়া, শহরের বাসিন্দাদের প্রতিটি অলিগলি, এমনকি প্রতিটি নির্জন স্থানেও অনুসরণ করতে লাগল সূর্য। যেখানে পেল সেখানেই আঘাত হানল ওদের ওপর।

প্লেগের আক্রমণও বেড়ে গেল আশ্চর্যজনকভাবে। প্রথম সপ্তাহে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল সাতশোর কাছাকাছি। শহরে নেমে এল গভীর অবসাদ। শহরতলির দীর্ঘ রাস্তা আর সিঁড়ি থেকে হারিয়ে গেল প্রাণের চিহ্ন। প্রতিটি বাড়ির দরজাই সব সময় বন্ধ অবস্থায় দেখা যায় এখন, জানালাগুলো খোলা থাকলেও সেগুলোতে ঝোলে পর্দা। মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ি থেকে ভেসে আসে আকস্মিক কান্নার শব্দ, আর্তনাদ। প্রথম প্রথম বাড়ির বাইরে রীতিমত ভিড় জমে উঠত লোকজনের। সবাই জানার চেষ্টা করত কী ঘটেছে? কিন্তু

দীর্ঘদিন ধরে এই বিপর্যয়ের মাঝে বাস করতে করতে সবার মন কঠিন হয়ে উঠল। এখন কেউই আর ওই ধরনের দৃশ্যে কিংবা শব্দে বিচলিত বোধ করে না, খুব সহজে পাশ কাটিয়ে যায়। করুণ আর্তনাদকে ওদের মনে হয় মামুলি কোন কথাবার্তা।

শহরের ফটকের সামনে প্রতিদিন মারামারি হয়। তা ঠেকানোর জন্যে পুলিসকে অনেক সময় আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়। এই সংঘর্ষের ফলে নিয়মিত কেউ না কেউ আহত হচ্ছেই। শুধু ফটকের সামনেই নয় শহরের সবখানে বিরাজ করছে একটা থমথমে উত্তেজনা।

তাই, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যে বন্দোবস্ত করা হলো এক নতুন ধরনের পাহারার। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে আরম্ভ করল অশ্বারোহী পুলিস; নুড়িবিছানো শূন্য রাস্তায় শোনা যেতে লাগল ঘোড়ার খুরের শব্দ। আর মাঝে মাঝে শোনা যায় গোলাগুলির আওয়াজ। রোগের সংক্রমণ যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্যে শহরের সমস্ত কুকুর আর বেড়াল মারার একটা ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে; গোলাগুলির আওয়াজ ওই ব্রিগেডের কর্মতৎপরতার ফল।

আরও একটি কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল শহরবাসীরা। সবাই আশঙ্কা করছে গ্রীষ্মকালে মহামারীর প্রকোপ আরও বেড়ে যাবে। আর গ্রীষ্ম যে এসে গেছে চারদিকে তার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে সুস্পষ্টভাবে। ছাদের ওপর ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে চামচিকের সংখ্যা, সেই সঙ্গে চিঁ-চিঁ চিৎকার।

জাঁ তারিউ তখনও লিখে যাচ্ছে ওর ডাইরি। প্লেগের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে করতে এক জায়গায় ও মন্তব্য করল: 'যেদিন থেকে বেতারে মৃতের সাপ্তাহিক সংখ্যা ঘোষণার বদলে রোজকার সংখ্যা ঘোষণা শুরু হলো, সেদিন থেকে মহামারীর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে; মনে হচ্ছে সংবাদপত্র এবং সরকারি

কর্তৃপক্ষ প্লেগের সঙ্গে এক ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলতে নেমেছেন; কেননা শুধু মাত্র সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, দিনে একশো ত্রিশটি মৃতের সংখ্যা সাপ্তাহিক নশো দশটি মৃত্যুর চেয়ে অনেক কম; সুতরাং তারা ভেবে আনন্দ পাচ্ছেন, এ প্রতিযোগিতায় তারাই জিতেছেন।'

এছাড়াও, মহামারীজনিত যেসব অপ্রত্যাশিত বা চমকপ্রদ ঘটনা পথচলতি চোখে পড়ছিল তারিউ-এর সেগুলোরও উল্লেখ আছে ওর ডাইরিতে। যেমন একদিন, এক জনশূন্য রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে ও, এমন সময় ঠিক ওর মাথার ওপর তিনতলার এক অন্ধকার শোবার ঘরের জানালা আকস্মিকভাবে খুলে গেল এবং তার ভেতর থেকে একজন মহিলা বার দুই চিৎকার করার পর জানালাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল তেমনিভাবে।

তারিউ ওর ডাইরির আর এক জায়গায় লিখেছে: 'হঠাৎ শহরের সমস্ত দোকান থেকে পিপারমেন্ট লজেন্স উধাও হয়ে গেল, কারণ মানুষ বিশ্বাস করে এই লজেন্স মুখে রাখলে প্লেগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।'

আগের মতই সামনের বারান্দায় ওর সেই প্রিয় প্রাণীটির গতিবিধি লক্ষ্য করে যাচ্ছে ও। তারিউ-এর মনে হলো, দুর্ভাগ্য এই অবলা-পশু শিকারীকেও স্পর্শ করেছে। একদিন সকালে রাস্তায় বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল; গুলির আঘাতে বেশির ভাগ বেড়ালই মারা পড়ল, বাকিগুলো উধাও হয়ে গেল প্রাণের ভয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন ছোটখাট শরীরের বুড়ো মানুষটা। তাঁর মুখে দেখা গেল বিস্ময়ের ভাব, শেষে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে এদিকে-ওদিকে তিনি খুঁজতে লাগলেন বেড়ালগুলোকে। এইভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হাতে যে কয়েক টুকরো কাগজ ছিল সেগুলোকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে

ভদ্রলোক ফিরে গেলেন ঘরে। তারপর আবার ফিরে এলেন বারান্দায়, এবার আগের চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করে ফের চলে গেলেন ঘরে; ঢুকেই বন্ধ করে দিলেন সমস্ত জানালা। এক সপ্তাহ ধরে এই কাণ্ডই করলেন বৃদ্ধ। যতই দিন যেতে লাগল তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল কেমন একটা বিষাদ আর হতবুদ্ধির ভাব। আট দিনের দিন তাঁকে আর দেখা গেল না, শহরের আর সকলের মত তিনিও বন্ধ করে রাখলেন জানালা।

জাঁ তারিউ তার ডাইরিতে লিখেছে: 'রোজ সন্ধ্যায় বাইরে থেকে হোটেলে ফেরার পর চোখে পড়ে হোটেলের দারোয়ান বন্দুক হাতে প্রহরীর মত গেটের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে। কারও সঙ্গে কথা হলেই লোকটা বলে, এসব যে ঘটবে তা সে আগেই জানত। আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম, সে ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, এর চেয়ে ভূমিকম্প হলেই ভাল হত, একবারেই সবকিছু ওলট-পালট করে দিত।

'হোটেলের ম্যানেজারকেও হতাশাগ্রস্ত, বিষণ্ন দেখায়। মহামারীর প্রথম দিকে যারা বাইরে থেকে এসে হোটেলে উঠেছিল, শহর ছেড়ে যাবার কোন উপায় নেই দেখে তাদের অনেকেই হোটেলে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা যখন দেখছে প্লেগ কমার কোন লক্ষণই নেই, তখন সবাই, একে একে, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাসায় উঠে যাচ্ছে। যে দু'একজন হোটেলে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে আমি তাদের একজন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই ম্যানেজার বলেন, অতিথি ভদ্রলোকদের কাউকে তিনি অসুবিধায় ফেলতে চান না, নাহলে অনেক আগেই হোটেল বন্ধ করে দিতেন। তিনি প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, মহামারী কতদিন ধরে চলবে বলে আমার ধারণা? আমি বলি, লোকে বলে শীতে এসব রোগ আপনা থেকেই বিদায় নেয়। শুনে উনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন,

কিন্তু আমাদের এখানে তো তেমন শীত পড়ে না।

'ক'দিন অনুপস্থিতির পর হোটেলে আবার দেখা গেল প্যাঁচা-মুখো ভদ্রলোককে। সঙ্গে দম-দেয়া পুতুলের মত নড়াচড়া করছে ছেলেমেয়ে দুটি। কিন্তু ওর স্ত্রী আসেননি। শুনতে পেলাম তাঁর মা প্লেগে আক্রান্ত, তাই তাঁর সেবাশুশ্রূষা নিয়ে তিনি ব্যস্ত। ম্যানেজার এই পরিবারটির হোটেলে আসাটাকে ভাল চোখে দেখেন না। বলেন, এই পরিবারের সবাইকে তিনি সন্দেহ করেন। কিন্তু মি. অথন তাঁর এতদিনের অভ্যাস প্লেগের ভয়ে পরিত্যাগ করেননি। আগের মতই নিজের স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বসেন খাবার টেবিলে। ছেলেমেয়ে দুটো বসে সামনে। উদাসীন কণ্ঠে তিনি ওদের আচার-আচরণ নিয়ে কথা বলেন, উপদেশ দেন। দারোয়ানও মি. অথনকে পছন্দ করে না। আমাকে ও প্রায়ই বলে, এই যে ফিটফাট ভদ্রলোকটাকে দেখছেন, মরবার সময়ও উনি অমনি সাজগোছ নিয়েই মরবেন, ভাবখানা এমন যেন জামাজুতো পরে তৈরি হয়েই আছেন, এখন শুধু ডাক এলেই হয়, আবার যে কেউ ওকে অন্য কাপড় পরাবে সে সুযোগ উনি দেবেন না।

'একদিন ডাক্তার রিও-র সঙ্গে বেড়াতে গেলাম ওর হাঁপানি রোগীর বাসায়। আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় হাত দুটো কচলাতে শুরু করলেন ভদ্রলোক, এটাই তাঁর চিরদিনের অভ্যেস। বৃদ্ধ তখন তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন, বরাবর যেমন থাকে তেমনি তাঁর সামনে রাখা ছিল দুটো মটরদানা ভর্তি পাত্র। আমাকে দেখে মন্তব্য করলেন, এই যে আরও একজন এসেছেন, পৃথিবীতে সবকিছুই উল্টে-পাল্টে গেছে দেখছি, এখন দেখছি রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যাই বেশি।

'ওই বৃদ্ধ একজন ব্যবসায়ী। পঞ্চাশে পা দিয়ে তিনি অনুভব করলেন একজন মানুষের জীবনে যতটুকু পরিশ্রম করা প্রয়োজন

ইতিমধ্যে তিনি তার সবটুকু সেরে ফেলেছেন। তারপর থেকে বিছানা নিয়েছেন তিনি।

'সামান্য একটা বাঁধা আয় তাঁর আছে, আর সেটাই সম্বল করে তিনি তাঁর এতদিনের খরচপত্র চালিয়ে এসেছেন। এখন তাঁর বয়েস পঁচাত্তর। ঘড়ি একদম সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মতে, ঘড়ি মূর্খদের প্রয়োজন, অথচ দামও অনেক। তিনি সময় হিসেব করেন দুটো পাত্রে রাখা মটরদানার সাহায্যে। সকালে তাঁর সামনে দুটো পাত্র রাখা হয়; একটা মটরদানায় ভর্তি, অন্যটা খালি। ঘুম থেকে উঠেই তিনি ভর্তি পাত্রটা থেকে মটরদানা তুলে খালি পাত্রটাতে রাখতে শুরু করেন। এইভাবে দুটো পাত্র আর মটরদানার সাহায্যে সময় নির্ণয় করেন তিনি। পরপর পনেরোবার ভরা শেষ হলে দুপুরের খাবার সময় হয় তাঁর। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, স্রষ্টা বলে কেউ নেই বোধহয়, থাকলে পাদ্রিদের থাকার প্রয়োজন হত না।'

শুধু ডাইরিই নয়, প্লেগ-আক্রান্ত জীবনযাত্রার এক দীর্ঘ রচনায় হাত দিয়েছিল জাঁ তারিউ। ভূমিকায় লেখা আছে: মাতাল ছাড়া এখন আর এই শহরে কাউকে হাসতে দেখা যায় না; আর হাসতে আরম্ভ করলে তাদের কোন মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

একদিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ও লিখেছে: 'সকাল থেকে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ নির্জন। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। সারারাত ধরে প্লেগ তার শিকারের পালা শেষ করে নতুন করে শিকার ধরার আগে এই ফাঁকটুকুতে একটু বিশ্রাম নেয়। চারপাশের দোকানগুলোতে নোটিস ঝুলছে "প্লেগের জন্যে বন্ধ।" রাস্তার মোড়ে মোড়ে শুয়ে আছে ভিক্ষুকের দল। ঘুমের ভেতর মানুষ যেমন হাঁটে, তেমনিভাবে খবরকাগজ হাতে এগিয়ে যাচ্ছে হকাররা। একটু পরে শুরু হলো ট্রাম চলাচল, অমনি সারা শহরে ঘুম থেকে জেগে উঠল প্লেগ।

সংবাদপত্রের বড় বড় স্পষ্ট হরফে লেখা প্লেগের শিরোনামে সবাই পড়ল, আজ মৃতের সংখ্যা ১২৪।

'এখন শহরে চলাচলের একমাত্র বাহন ট্রাম। ফুটবোর্ডের ওপর যেমন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ঝোলে হাতল ধরে। ট্রামগুলোর চলতে খুব কষ্ট হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ট্রামের ভেতর প্যাসেঞ্জারেরা পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য, সংক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানো। ট্রাম থেকে রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াতে যেখানে তার সঙ্গে নিকটতম ব্যক্তিটির নিরাপদ একটি দূরত্ব বজায় থাকে।

'প্রথম ট্রামগুলো চলে যাবার পর আস্তে আস্তে জেগে ওঠে শহর। সকালে যে দোকানগুলোতে ভিড় হয় খুলে যায় সেগুলোর দরজা। কাউন্টারে দেখা যায় অসংখ্য রকমের কার্ড। কোনটায় লেখা–"কফির ব্যবস্থা নেই," কোনটায়–"চিনি সঙ্গে আনবেন।"

'দুপুরে ভরে যায় সমস্ত রেস্তোরাঁ। যারা বসবার জায়গা পায় না তারা দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে, বাইরের সামিয়ানার তলায়। রেস্তোরাঁয় নোটিস ঝোলানো আছে "এখানে প্লেট বাদে, অন্য সব জিনিস, কাঁটাচামচ এগুলো জীবাণুমুক্ত করার জন্যে নিয়মিত ধুইয়ে নেয়া হয়।" তাই খাবার সময় দেখা যায় প্রত্যেকে নিজের প্লেট ঠিকমত দেখে শুনে মুছে নিচ্ছে।

'সন্ধ্যায়, স্রোতের মত বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে মানুষ। আর বকবক করতে থাকে। কেউ মেতে ওঠে যুক্তিতর্কে, কেউ তন্ময় হয়ে ডুবে যায় প্রেম বিনিময়ে। শহরের অধিবাসীরা উপলব্ধি করেছে এক কঠিন বিপদ তাদের সামনে অপেক্ষা করছে; তাই ওরা সন্ধ্যায় নিজেদের ডুবিয়ে দিতে চায় সম্পূর্ণ আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে, বিকারগ্রস্ত উল্লাসে।'

সাত

জাঁ তারিউ-এর ডাইরিতে ডাক্তার রিও-র সঙ্গে ওর একটা সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে। সাক্ষাৎকারটি নেয়ার জন্যে রিও-র বাসায় যায় সে। তারিউ পৌঁছবার ঠিক আগে রিও ওর মা-র মুখের দিকে তাকাল। খাবার ঘরের এক কোণে বসে আছেন ওর মা। চোখ দুটো পড়ে আছে বাইরে শূন্য রাস্তার ওপর। মহামারীর পর থেকে রাস্তার আলো তিনভাগের দুইভাগ কমানো হয়েছে।

'প্লেগ না থামা পর্যন্ত রাস্তায় আলো এমনই থাকবে, না?' জিজ্ঞেস করলেন মাদাম রিও।

'হ্যাঁ, মা।'

রিও দেখল ওর মা-র দৃষ্টি এসে পড়েছে ওর কপালের ওপর।

নিশ্চয় গত কয়েকদিনের অতিরিক্ত খাটুনি আর উৎকণ্ঠার ফলে ওর কপালে ক্লান্তির ছাপ দেখা দিয়েছে।

'আজকের দিনটা কেমন গেল?' জানতে চাইলেন মা।

'আগের মতই।'

ঠিকই বলেছে রিও। প্যারিস থেকে আনা নতুন সিরামগুলো আগের সিরামের মত কাজ দিচ্ছে না, ফলে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। রোগীর দেহের ফোঁড়াগুলো সহজে ফাটতে চাইছে না। সুপারির মত শক্ত হয়ে উঠছে। এদিকে মহামারী নতন রূপ নিচ্ছে। প্লেগ থেকে

দেখা দিচ্ছে নিউমোনিয়া। ডাক্তারদের পরামর্শে প্রিফেক্ট কিছু নতুন আইন-কানুন প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু অবস্থার তাতে কোন পরিবর্তন হয়নি।

ছোটবেলায় মায়ের বাদামী কোমল চোখের দিকে তাকালে রিও একধরনের ভালবাসা অনুভব করত, আজও মায়ের দিকে চেয়ে ওর স্মৃতির সেই অনুভূতিটি জেগে উঠল।

'মা, তুমি ভয় পাও না?'

'এই বয়সে আর ভয় পাবার কি আছে রে।'

'আমি ঠিকমত প্রায়ই বাসায় ফিরতে পারি না।'

'তুই ফিরে আসবি, এটা ভাবলে আমার অপেক্ষা করতে খারাপ লাগে না। আর কোন খবর আছে?'

'তোমার বউমা ওর শেষ টেলিগ্রামে লিখেছে সবকিছু ঠিকমত চলছে। জানো মা, আমি যাতে উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ি, সেজন্যেই ও অমন লেখে।'

দরজায় বেল বেজে উঠল। দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেল রিও। তারিউকে একটা ধূসর রঙা প্রকাণ্ড ভালুকের মত দেখাচ্ছে। ওকে বসার জন্যে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল রিও।

তারিউ সরাসরি ওর বক্তব্য শুরু করল। 'বড়জোর পনেরো দিন কি একমাস, তারপর সবকিছু আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'শুনছি বাধ্যতামূলকভাবে সবল দেহের সব মানুষকেই নাকি মহামারী প্রতিরোধের কাজে সাহায্য করতে হবে?'

'কর্তৃপক্ষ তাই ভাবছেন, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে না।'

'তাহলে স্বেচ্ছাসেবকের আহ্বান জানাতে পারেন।'

'হয়েছে, কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি।'

'সেটা তো সরকারিভাবে করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের ওপর দায়িত্ব দেয়া উচিত।'

'কী করতে বলেন আপনি এই অবস্থায়?'

'যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে চায়, এমন কিছুসংখ্যক মানুষকে নিয়ে কয়েকটা দল গড়ে তোলার একটা প্ল্যান তৈরি করেছি আমি। প্ল্যানটাকে যাতে কার্যকর করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।'

'নিশ্চয়ই। কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আপনার প্ল্যান অনুমোদন করিয়ে নেয়ার সমস্ত দায়িত্ব আমার। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অজানা নেই, এই কাজে যারা সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে চায়, তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন হবারও কিছুটা আশঙ্কা রয়েছে তাতে। আপনি এই বিপদের সম্ভাবনা ভালভাবে চিন্তা করে দেখেছেন তো?'

'এই মুহূর্তে আমি শুধু এইটুকু জানি: শহরে বহুলোক অসুস্থ, তাদের চিকিৎসা এবং সেবার প্রয়োজন। আমি তাদের রক্ষা করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছি। আমার জন্য এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

তারিউ কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে রইল রিও-র মুখের দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। রিও অনুসরণ করল ওকে।

রাস্তায় নেমে ওদের মনে হলো, অনেক রাত হয়েছে, এগারোটা বাজে বোধহয়। একটা অস্পষ্ট খসখসে শব্দ ছাড়া শহরের চারদিক শান্ত। দূরে, শোনা যাচ্ছে একটা অ্যাম্বুলেন্সের ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ। দুজনে গাড়িতে ঢুকল, এঞ্জিন স্টার্ট দিল রিও।

'কাল একবার হাসপাতালে আসবেন। এই দুঃসাহসিক কাজে নামার আগে একটা ইনজেকশন দেব আপনাকে। মনে রাখবেন,

আপনার মৃত্যুর আশঙ্কা তিন আর বাঁচার সম্ভাবনা মাত্র এক।'

'প্রায় একশো বছর আগে প্লেগের আক্রমণে পারস্যের এক শহরে সমস্ত লোক নির্মূল হয়ে যায়, বেঁচেছিল শুধু একজন। ওই মানুষটির কাজ ছিল প্লেগে যারা মারা যেত তাদের গোসল এবং দাফন করা।'

আট

পরের দিন থেকেই কাজ শুরু করে দিল তারিউ। কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে গড়ে তুলল একটা স্যানিটারি দল। পরে, ওর পরিচালনায় আরও এই ধরনের অনেক দল গড়ে উঠল। এই স্কোয়াডগুলো শহরবাসীদের দুর্যোগ মোকাবিলায় সাহায্য করল, সেই সঙ্গে তাদের মনে এই উপলব্ধিও জাগাল, প্লেগকে পরাজিত করার জন্যে যা কিছু করা দরকার তার সবটাই নির্ভর করছে তাদের ওপর।

ঠিক এই সময়ে শহরে এক শ্রেণীর নীতিবাগিশ গজিয়ে উঠল। তারা প্রচার করতে শুরু করল, মহামারীর বিরুদ্ধে করার কিছুই নেই, এটাকে মেনে নিতে হবে। জাঁ তারিউ, রিও এবং ওদের বন্ধু-বান্ধবরা অবশ্য অটল রইল নিজেদের সিদ্ধান্তে। সে-সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে উঠল, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা, আর খুব বেশি লোক যাতে তাদের প্রিয়জনদের

কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না পারে তার উপযোগী ব্যবস্থা নেয়া। এবং ওরা তাই করে চলল।

ডাক্তার ক্যাসেলও ওই অবস্থায় সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজটি করতে এগিয়ে এল। হাতের কাছে যেসব যন্ত্রপাতি পেল সেগুলো দিয়েই অটল বিশ্বাসে প্রস্তুত করতে লাগল সিরাম, নিজের শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে।

গ্রাঁদও সোৎসাহে স্যানিটারি স্কোয়াডে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতে এগিয়ে এল। এতটুকু ইতস্তত করতে দেখা গেল না ওকে। শুধু একটাই অনুরোধ করল সে, একটু হালকা ধরনের কাজ যেন দেয়া হয় তাকে, কারণ এই বয়েসে কঠিন কাজ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে কাজ দেয়া হলো রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং পরিসংখ্যান রাখার।

কোন কোন দিন সন্ধ্যায় রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং পরিসংখ্যানের কাজ শেষ হয়ে যায়। তখন গ্রাঁদ আর রিও গল্প জুড়ে দেয়। কিছুদিন পরে তারিউও ওদের গল্পে যোগ দিতে লাগল নিয়মিতভাবে। এখন আগের চেয়ে অনেক সহজভাবে এ দুই বন্ধুর কাছে জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করে গ্রাঁদ।

'আপনার সেই অশ্বারোহিণী ভদ্রমহিলা কতদূর এগুলো?' তারিউ মাঝেমাঝে জিজ্ঞেস করে গ্রাঁদকে। গ্রাঁদ হেসে জবাব দেয়, 'ঘোড়া কদমে চলেছে। সত্যিই।'

একদিন সন্ধ্যায় গ্রাঁদ ঘোষণা করল, 'আমি আমার অশ্বারোহিণী নায়িকার আগে "রুচিসম্পন্না এক যুবতী" শব্দগুলো ব্যবহার না করে "তন্বী" শব্দটি ব্যবহার করব।'

কিছুদিন পর প্রকাশ পেল, অফিসের কাজে অমনোযোগী হয়ে উঠেছে গ্রাঁদ। একদিন, দফতরের প্রধান ওকে ডেকে ভীষণ ধমকালেন। আসলে গ্রাঁদ ক্রমেই পরিশ্রান্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিল,

কিন্তু তা সত্ত্বেও ও স্যানিটারি স্কোয়াডের জন্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, অফিসের হিসেবপত্র ঠিক রাখা, এসব কাজগুলো ঠিকমত করে যাচ্ছিল।

নয়

র‍্যাবেয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিছুতেই প্লেগের কাছে পরাভব মানবে না। এবং তার জন্যে সংগ্রামও করছিল ও। যখন বুঝতে পারল ও বৈধ উপায়ে শহরের বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না, তখন ঠিক করল ভিন্ন রাস্তায় চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমে ও যোগাযোগ করল বিভিন্ন কাফের ওয়েটারদের সঙ্গে। প্রতি শহরেই দৃষ্টির আড়ালে কোথায় কী ঘটছে তার খবর রাখে কাপের ওয়েটাররা।

প্রথমে যার সঙ্গে ওর কথা হলো সে জানাল পালাবার চেষ্টা করলে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। পরে অন্য একটা কাফের ওয়েটাররা ওকে চর ভেবে বসল, এবং বের করে দিল কাফে থেকে।

একদিন রিও-র বাসায় এ নিয়ে কথা বলছে র‍্যাবেয়া, এমন সময় সেখানে এল কটার্ড। ওদের কথাবার্তা শুনে ফেলল ও। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ কটার্ড-এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো র‍্যাবেয়া-র। বেশ আন্তরিকতার সাথে ওকে অভ্যর্থনা জানাল কটার্ড।

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করবেন। লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার কোন ক্ষতি হোক, তা আমরা চাই না।

বাংলাপিডিএফ.নেট

'আরে র‍্যাবেয়া যে। এখনও কিছু করতে পারেননি মনে হচ্ছে।'

'না, কিছুই না।'

এরপর কটার্ড যা বলল তাতে থ হয়ে গেল র‍্যাবেয়া। কিছুদিন হলো শহরের বিভিন্ন কাফেতে ঢুঁ মেরে বেড়ানোই কটার্ড-এর একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে। এতে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর। তাদের কাছ থেকে ও জানতে পেরেছে লোক পাচার করার একটা সংস্থা নাকি শহরে আছে।

'সত্যিই আপনি খবর দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাবেয়া।

'অবশ্যই। এরকম একটা প্রস্তাব এসেছিল আমার কাছে।'

'ওদের সাথে যোগাযোগ করার উপায় কী?'

'সেটা অবশ্য খুব সহজ নয়। আচ্ছা, আসুন দেখি আমার সঙ্গে।'

তখন বিকেল চারটা। মাথার ওপর গুমোট আকাশ। অসহ্য গরম পড়েছে। পথেঘাটে কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। দোকানপাটের সামনে পর্দা টানানো। ছায়াঘেরা একটা রাস্তা ধরে বেশ কিছুদূর নীরবে হাঁটল ওরা দুজন।

র‍্যাবেয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কটার্ড বলল, রাস্তায় কুকুর চোখে পড়ছে না। সাধারণত এ-সময় কুকুরগুলোকে দেখা যায় দরজার সামনে ক্লান্তভাবে গড়াতে, এবং লম্বা জিভ বের করে হাঁফাতে।

দুজনে বুলেভার্দে দ্য পালামিয়ার সামনে দিয়ে এগিয়ে, প্যালেস দ্য আর্মসকে পিছনে ফেলে আরও কিছুদূর হাঁটার পর মোড় নিল ডকইয়ার্ডের দিকে। বাঁ হাতে পড়ল সবুজ রঙের একটা কাফে। সামনে একটা হলুদ রঙের সামিয়ানা টানানো। একেবারে রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে সামিয়ানাটা।

ভেতরে ঢুকে কপালের ঘাম মুছল ওরা। চারপাশে কয়েকটা

টেবিল। সেগুলোও সবুজ রঙের। ভেতরে কোন লোক নেই। ভনভন করছে মাছি। মদ বিক্রির কাউন্টারে বসে আছে একটা তোতা পাখি। দেয়ালে ঝুলছে মাকড়সার জালে ঢাকা কতকগুলো পুরানো ছবি।

প্রত্যেকটা টেবিলে পাখির শুকনো বিষ্ঠা ছড়ানো। র‍্যাবেয়া ভাবছে এগুলো এল কোত্থেকে, এই সময়ে ঘরের এক অন্ধকার কোণ থেকে ডানা ঝাপটিয়ে লাফাতে লাফাতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সুন্দর একটা মোরগ।

কটার্ড গা থেকে কোট খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে, বারকয়েক জোরে জোরে ঘা দিল টেবিলে। খুলে গেল পিছনের দরজাটা। বেরিয়ে এল গলাবন্দ নীল অ্যাপ্রন পরা এক লোক। বেঁটে। প্রায় চিৎকার করে কটার্ডকে অভিবাদন জানাল ও। লাথি মেরে মোরগটাকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় নিজে এসে দাঁড়াল। ওর গলার জলদগম্ভীর আওয়াজে চাপা পড়ে গেল মোরগটার কঁক্ কঁক্ শব্দ। মদের ফরমাশ দিয়ে কটার্ড জানতে চাইল, গ্রাসিয়া কোথায়? বামন জানাল, গত কয়েকদিন থেকে গ্রাসিয়াকে কাফেতে দেখা যায়নি।

'আজ সন্ধ্যায় আসবে?'

'কী করে বলি। সে কি তার সব গোপন কথা আমাকে জানায়। আপনিই তো ভাল জানেন কখন আসবে বা আসবে না।'

'না, তা নয়। আমি আমার এই বন্ধুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

বামন ওদের পাশে বসে ভেজা হাত দুটো পরনের অ্যাপ্রনে মুছল।

'এই ভদ্রলোকও আপনার মত ব্যবসা করে?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে জবাব দিল কটার্ড।

'দেখা যাক। সন্ধ্যার দিকে একবার আসুন। ছেলেটাকে দিয়ে ওকে না হয় খবর পাঠাব।'

কাফে থেকে বেরিয়ে র‍্যাঁবেয়া কটার্ড-এর কাছে জানতে চাইল, 'লোকটা কিসের ব্যবসার কথা বলছিল?'

'চোরাচালানের কথা। ফটকের পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে কিছু জিনিস ওরা শহরের ভেতর পাচার করে। এতে প্রচুর টাকা।'

'বুঝলাম। তাহলে কোর্ট-কাছারিতে নিশ্চয় ওদের অনেক জানাশোনা লোক আছে।'

'ঠিক ধরেছেন।'

সন্ধ্যার দিকে কাফেতে ফিরে ওরা দেখল সামিয়ানা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। খাঁচার ভেতর চেঁচাচ্ছে তোতা পাখিটা। লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে টেবিলগুলোর চারপাশে। কিন্তু কারও গায়েই শার্ট ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ছে না। কটার্ডকে দেখেই একজন উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। ওর শার্টের বোতাম সব খোলা। বুকের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে, লাল ইটের মত রঙ। মাথায় শোলার টুপি। রোদে পোড়া মুখটা তামাটে রঙের। চোখ দুটো ছোট, রঙ কালো। দাঁতগুলো সাদা ঝকমকে। আঙুলে তিনটি আংটি। নাকটা বেশ মোটা। মুখটা ভরাট। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। এরই নাম গ্রাসিয়া।

'বাহ্,' র‍্যাঁবেয়ার উপস্থিতি উপেক্ষা করে কটার্ডকে বলল গ্রাসিয়া, 'চলুন, দু'এক গ্লাস টানা যাক।'

ওরা নীরবে বসে মদ্যপান করল। 'চলুন, একটু বাইরে হাঁটি,' প্রস্তাব করল গ্রাসিয়া।

তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে বন্দরের দিকে এগোল। গ্রাসিয়া জানতে চাইল, কাজটা কী ধরনের? কটার্ড বলল, র‍্যাঁবেয়া শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়। সিগারেট টানতে টানতে আগে আগে

হাঁটছে গ্রাসিয়া। র‍্যাবেয়া সম্পর্কে ও কিছু প্রশ্ন করল।

'কেন, পালাতে চান কেন?'

'ওর স্ত্রী ফ্রান্সে থাকে।'

'কী করেন ভদ্রলোক?'

'সাংবাদিকতা।'

'এখনও? সাংবাদিকরা কিছু গোপন রাখতে পারে না।'

'আগেই বলেছি, উনি আমার বন্ধু।'

হাঁটতে হাঁটতে জেটির কাছাকাছি এসে পড়ল ওরা। চারপাশে বেড়া, ঢোকার পথ বন্ধ। মোড় নিয়ে এবার ওরা এগিয়ে গেল একটা তাড়িখানার দিকে। মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে ওখান থেকে।

'যা হোক,' বলল গ্রাসিয়া, 'এ-ব্যাপারে সরাসরি আমি সাহায্য করতে পারব না। রাউল এজন্যে উপযুক্ত লোক। কথা বলে দেখব। কাজটা কিন্তু সোজা নয়।'

'বেশ,' আগ্রহ দেখাল কটার্ড।

গ্রাসিয়া আর কিছু বলল না। তাড়িখানায় ঢোকার আগে থামল ও। এবং এই পথম সরাসরি সম্বোধন করল র‍্যাবেয়াকে।

'পরশু বেলা এগারোটায় শহরের উপকণ্ঠে, কাস্টমস ব্যারাকের সামনে দেখা হবে,' এই বলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল গ্রাসিয়া, কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এ-ভাবে বলল, 'মনে রাখবেন, কিছু মালকড়ি খরচ করতে হবে।'

'জানি,' সম্মতি জানাল র‍্যাবেয়া।

দু'দিন পর। শহর থেকে যে বড় রাস্তাটা বাইরে চলে গেছে সেই রাস্তায় দেখা গেল কটার্ড আর র‍্যাবেয়াকে। পথের দু'পাশে কোন গাছপালা নেই। কাস্টমস ব্যারাকের একটা অংশকে রূপান্তরিত করা হয়েছে হাসপাতালে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু

লোক, হয়তো রোগী দেখার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছে।

'আমি ঠিক বুঝছি না, আপনি বাইরে যেতে চাইছেন কেন? এখানে তো বেশ কৌতূহল জাগানোর মত ব্যাপার ঘটছে,' বলল কটার্ড।

'না, এ-সব ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই,' জানাল র‍্যাঁবেয়া।

'অবশ্য থাকলে বিপদের ঝুঁকি আছে।'

ঠিক তখুনি রিও-র গাড়ি এসে থামল ওদের পাশে। গাড়ি চালাচ্ছে তারিউ, ঘুম-ঘুম চোখে বসে আছে রিও। র‍্যাঁবেয়াকে শহরে পৌঁছে দিতে চাইল তারিউ।

'ধন্যবাদ। এখানে একজনের সঙ্গে দেখা করব,' বলল র‍্যাঁবেয়া।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রিও। 'সত্যিই, দেখা করব একজনের সঙ্গে,' নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করল র‍্যাঁবেয়া।

'ডাক্তার সাহেবও ব্যাপারটা জানেন নাকি?' কটার্ড বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'আস্তে। ওই যে মাজিস্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে,' কটার্ডকে বলল তারিউ।

নিমেষে বদলে গেল কটার্ড-এর চাহনি। দ্রুত পায়ে হেঁটে এলেন এম অথন। কাছে এসে টুপি নামালেন মাথা থেকে। সুপ্রভাত। জানাল তারিউ। ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে অভিবাদন জানালেন গাড়ির ভেতরের দুজনকে, তারপর রাস্তায় দাঁড়ানো দুজনের দিকে ফিরে সামান্য একটু মাথা নোয়ালেন। এম অথন-এর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল তারিউ। আকাশের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অথন। তারপর মন্তব্য করলেন, 'সত্যি, বড্ড দুঃসময়

যাচ্ছে। মসিয়ে তারিউ, আপনার কাজ সত্যিই এক মহৎ দৃষ্টান্ত। আচ্ছা, ডাক্তার, মহামারী কি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে?'

রিও বলল, 'প্রত্যেকেরই কামনা করা উচিত এর চেয়ে খারাপ কিছু ঘটবে না।'

তারিউ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানতে চাইল, 'আপনার কাজ-কর্ম কি এখন বেড়ে গেছে?'

'যা ভাবছেন ঠিক তার উল্টো। মারাত্মক ক্রিমিন্যাল কেসগুলো কমে এসেছে। আইন-কানুন মানুষ এখন অনেক ভালভাবে মেনে চলে।'

চলে গেলেন অথন। গাড়িতে স্টার্ট দিল তারিউ। কিছুক্ষণ পর কটার্ড এবং র‍্যাবেয়া লক্ষ করল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে গ্রাসিয়া। কাছে এসে বলল, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

চারপাশের ভিড়ের ভেতর মেয়েমানুষের সংখ্যাই বেশি। প্রত্যেকের হাতে পুটুলি। আশা করছে হয়তো জিনিসটা পৌঁছে দিতে পারবে অসুস্থ স্বজনের কাছে। ব্যারাকের ফটকে সশস্ত্র পাহারা। ব্যারাক আর ফটকের মাঝখানে একটা আঙিনার মত। সেখান থেকে কিছুক্ষণ পর পর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত ভূতুড়ে চিৎকার। ভিড় জমানো লোকজন তখন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ভেতরের রোগীদের ওয়ার্ডের দিকে।

ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওইসব দেখতে লাগল। খানিক বাদে ওদের পিছনে এক কণ্ঠস্বর 'সুপ্রভাত' বলতেই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল তিনজনেই। এত গরমেও রাউল-এর পরনে কালো সুট, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। সুগঠিত দীর্ঘ দেহ ওর। চেহারাটা কেমন বিমর্ষ। ঠোঁটজোড়া না নড়িয়ে খুব দ্রুত আর পরিষ্কার ভাষায় বলল,

'চলুন, একটু সেন্টারের দিকে হাঁটা যাক। গ্রাসিয়া, তোমাকে আর দরকার নেই।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল গ্রাসিয়া। ওরা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। র‍্যাবেয়া আর কটার্ড দু'পাশে, মাঝখানে রাউল।

'গ্রাসিয়া আমাকে সব বলেছে,' বলল রাউল, 'ব্যবস্থা একটা হতে পারে। কিন্তু আগেই বলছি, পুরো দশ হাজার লাগবে।'

'আমি রাজি,' জানাল র‍্যাবেয়া।

'ডকের কাছাকাছি একটা স্প্যানিশ রেস্তোরাঁ আছে। কাল দুপুরে ওখানে আমরা খাব।'

র‍্যাবেয়া বলল, 'বেশ। তাই হবে।' এই প্রথম হাসল রাউল। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। ও চলে যাবার পর কটার্ড বলল, 'কাল দুপুরে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর তাছাড়া, আমাকে আপনার দরকারও হবে না।'

হলুদ রঙের ছোট্ট একটা রাস্তা। ওই রাস্তা থেকে কিছুটা নিচে অন্ধকার ঘরে স্প্যানিশ রেস্তারাঁ। নিয়মিত খদ্দেররা অধিকাংশই স্প্যানিশ বংশোদ্ভুত, অন্তত ওদের চোখের রঙ তাই বলে। র‍্যাবেয়া রেস্তোরাঁয় ঢোকার পর সবাই ওর দিকে সকৌতূহলে তাকাল। রাউল ভেতর থেকে ইশারা করতেই ওর দিকে এগিয়ে গেল র‍্যাবেয়া। সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখ থেকে উড়ে গেল কৌতূহল। নিজের নিজের প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল ওরা। রাউল-এর পাশে আজ বসে আছে লম্বাটে, লিকলিকে চেহারার একজন। দাড়ি-গোঁফ বিশ্রীভাবে কামানো। কাঁধ অসম্ভব রকমের চওড়া। মুখটা ঘোড়ার মুখের মত লম্বা। মাথার চুল পাতলা। জামার হাতা কনুই অবধি গোটানো। হাত দুটোয় মাংস বলতে কিছু নেই। কান পুরু লোমে

ঢাকা। পরিচয়ের পালা চুকে যাবার পর ধীরে ধীরে পরপর তিনবার মাথা নোয়াল লোকটা। ওর নাম অবশ্যি বলল না রাউল, লোকটার প্রসঙ্গ উঠলে ওকে 'আমাদের বন্ধু' বলে উল্লেখ করল।

'আমাদের এই বন্ধুর ধারণা ও হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। ও...' র‍্যাবেয়া কী খাবে সে ফরমাশ নিতে টেবিলের সামনে এক ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই আচমকা মাঝপথে থেমে গেল রাউল।

'ও আমাদের অন্য দুইজন বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবে। ওরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে ফটকের কয়েকজন পাহারাদারকে। তবে তার মানে এই না যে আপনি সাথে সাথে রওনা হতে পারবেন। কখন পালাতে পারবেন সেটা পাহারাদারেরাই ঠিক করে দেবে। ওদের কারও বাসায় আপনি কয়েক রাত থাকতে পারলে ব্যাপারটা আপনার জন্য সহজ হবে। ওদের বাসা ফটকের কাছেই। এখন আমাদের এই বন্ধুর কাজ হবে খুব তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া। এসব যখন শেষ হবে, তখন আপনি ওর সঙ্গে টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে পাকাপাকি কথা বলবেন।'

ঘোড়ামুখো 'বন্ধু' লোকটা, মুহূর্তের জন্যেও টম্যাটোর সালাদ চিবানো বন্ধ না করে, আবারও বার কয়েক তার ছুঁচলো মাথাটা ওপর-নিচে করল। তারপর যখন শেষ হলো খাওয়া তখন শুরু করল কথা। উচ্চারণে স্প্যানিশ টান। পরের দিন সকাল আটটায় শহরের গির্জার বারান্দায় র‍্যাবেয়াকে দেখা করতে বলল ও।

'তাহলে অন্তত আরও দু'দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,' মন্তব্য করল র‍্যাবেয়া।

'দেখুন, আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ওদেরও চারদিকে খোঁজ-খবর নিতে হবে,' উত্তর দিল রাউল।

ঘোড়ামুখো 'বন্ধু' আরেকবার আস্তে করে মাথা নেড়ে সমর্থন করল রাউলকে। কথা বলতে বলতে র‍্যাবেয়া জানল ঘোড়ামুখো লোকটা একজন উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়। ও নিজেও একসময় ফুটবল খেলোয়াড় ছিল, আর ফুটবলের প্রতি ওর আগ্রহও যথেষ্ট। খাওয়া শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ওদের মধ্যে বেশ একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এবং অচিরেই ঘোড়ামুখো র‍্যাবেয়াকে ঠাট্টাচ্ছলে বুড়ো খোকা বলে ডাকতে আরম্ভ করল। বলল, ফুটবল মাঠে একমাত্র সেন্টার-হাফরাই খেলা দেখাবার সুযোগ পেয়ে থাকে।

র‍্যাবেয়া ওর মত সমর্থন করল, যদিও সে নিজে খেলেছে সেন্টার ফরওয়ার্ড পজিশনে। মোটামুটি একটা শান্ত পরিবেশের মধ্যেই এগুচ্ছিল ওদের কথাবার্তা, হঠাৎ বেজে উঠল রেডিও। কয়েকটা হালকা গান শেষ হবার পর ঘোষণা করা হলো, আগের দিন প্লেগে মারা গেছে দুশো সাত জন। রেস্তোরাঁর কেউই বিচলিত হলো না খবরটা শুনে। একমাত্র ঘোড়ামুখো 'বন্ধু'ই কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাউল এবং র‍্যাবেয়াও উঠে পড়ল এই সঙ্গে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার পথে র‍্যাবেয়ার ডান হাত 'বন্ধু' নিজের মুঠোয় নিয়ে বেশ জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'আমার নাম গনজালেস।'

পরের দুটো দিন র‍্যাবেয়া-র কাছে মনে হলো যেন অনন্তকাল। রিওকে খুঁজে বের করে সমস্ত ঘটনা শোনাল ও। রিও তখন রোগী দেখার জন্যে বাইরে যাচ্ছিল; সে-ও চলল ওর সঙ্গে। এক রোগীর বাসায় পৌঁছুল ওরা।

'তারিউ ঠিকমত পৌঁছলেই হয়,' বলল রিও। ওকে তখন বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

'মহামারী কি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে?' প্রশ্ন করল

র‍্যাবেয়া।

রিও বলল, 'ঠিক তা নয়, তবে পরিস্থিতি সামলানোর মত যন্ত্রপাতি এবং লোকের বড্ড অভাব।'

'বাইরে থেকে ডাক্তার বা অ্যাসিস্টান্ট আসেনি?'

'এসেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অবস্থার অবনতি ঘটলে আমরা সামলাতে পারব না।'

'আমি কিন্তু সে-ভয়ে পালাতে চাইছি না। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু দীর্ঘদিন প্রেমিকাকে ছেড়ে থাকতে হবে, এটা কিছুতেই ভাবতে পারি না। অবশ্য আমি জানি না, জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণা কী।'

রিও বলতে যাচ্ছিল ওর উপলব্ধিও অনেকটা এই রকমই, ঠিক এ-সময় এসে পড়ল তারিউ। ওর মুখে কেমন একটা উত্তেজনার ভাব।

'ফাদার প্যানালুকে আমাদের কাজে যোগ দেয়ার কথা বলেছিলাম। উনি রাজি হয়েছেন।'

'বাহ্। মুখে যাই বলুন, কাজের সময় তো বাস্তববাদী মনে হচ্ছে। আমি খুশি হয়েছি,' বলল রিও।

'মাফ করবেন, এবার আমি বিদায় নেব,' বলল র‍্যাবেয়া।

বুধবার, অর্থাৎ যেদিন সাক্ষাতের কথা, আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই গির্জায় পৌঁছে গেল র‍্যাবেয়া। অন্যদিনের তুলনায় আজ বাতাস এখনও কিছুটা ঠাণ্ডা। আকাশে হালকা তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘ। ভেসে আসছে শিশিরের মৃদু গন্ধ।

গির্জার ঘড়িতে আটটা বাজল। শূন্য বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল র‍্যাবেয়া। ভেতর থেকে ভেসে আসছে ধূপের সুবাস। সঙ্গীতের সুর আস্তে আস্তে স্তিমিত হতে হতে একেবারে থেমে

গেল। জনা দশেক লোক গির্জার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে শহরের দিকে হাঁটতে থাকল। অধৈর্য হয়ে উঠল র‍্যাবেয়া। আবার কিছু লোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল র‍্যাবেয়া, হঠাৎ ভাবল এখানে সিগারেট টানা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আটটা দশে বেজে উঠল অর্গান। ভেতরে ঢুকল ও। প্রথমে আবছা আলোয় কিছুই ঠাহর করতে পারল না। সামনে একটা বেদী, তার ওপর একটা মূর্তি। হাঁটু-গেড়ে বসা মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের কতকগুলো ছোপ।

বাইরে এসে র‍্যাবেয়া দেখে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে গনজালেস। ওকে দেখে বলল, 'এই যে বুড়ো খোকা, আমি ভেবেছিলাম আপনি এতক্ষণে চলে গেছেন। অনেক দেরি করে ফেলেছি।' এরপর দেরি হওয়ার কারণটা জানাল ও, 'আটটা বাজার দশ মিনিট আগে বাসা থেকে বেরিয়েছি। যেখানে ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা, সেখানে অপেক্ষা করেছি বিশ মিনিট। কিন্তু তবু পাত্তা পেলাম না কারও। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। এই লাইনে কাজ করতে গেলে পদে পদে বিপদ।'

পরের দিন, একই সময়ে ওয়ার মেমোরিয়ালের সামনে দেখা হবে বলে কথা দিল গনজালেস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দিল র‍্যাবেয়া।

ওয়ার মেমোরিয়াল জায়গাটা পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা পার্কের মত দেখতে।

ওখান থেকে সমুদ্র চোখে পড়ে। পরের দিনও ওরা আসার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছুল র‍্যাবেয়া। সময় কাটানোর জন্যে পড়ল শহীদদের নামের তালিকা। কয়েক মিনিট পর দুজন লোক হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল ওর দিকে। কেমন একটা

নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, তারপর পার্কের দেয়ালে হাত রেখে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল নিচের জনশূন্য বন্দর। দুটো লোকের পরনেই একই রকম ফতুয়া আর নীল প্যান্ট। দুজনের উচ্চতাও সমান। একটু সামনে এগিয়ে একটা পাথরের বেঞ্চিতে বসল র‍্যাঁবেয়া। এমন সময় ওর দিকে হেঁটে এল গনজালেস। 'এর মধ্যে নিশ্চয় আপনাদের আলাপ হয়ে গেছে। এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক,' বলল ও।

ওদের একজনের নাম মার্সেল, অন্যজনের লুই। একজন বলল, 'দুদিনের মধ্যেই পোর্টে আমাদের ডিউটি শুরু হবে। তখন পুরো সপ্তাহ আমরা ওখানেই থাকব। সে-সময় দেখব কোন রাতটায় সুবিধে হবে। কিন্তু বিপদ আছে একটা। আমাদের সঙ্গে আরও দুজন পাহারায় থাকবে, ওরা সৈনিক। যতদূর সম্ভব, ওদের এসবের বাইরে রাখা ভাল। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় ওরা কাছের একটা শুঁড়িখানায় যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারে। এ-সময়টায় আপনি যদি আমাদের বাসায় থাকেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। আমাদের বাসা ফটক থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। তবে ঝটপট সবকিছু সেরে ফেলতে হবে। ফটকের সামনে আরও একটা পাহারা বসানোর কথাবার্তা চলছে।'

সম্মতি জানাল র‍্যাঁবেয়া। পকেটের সবকটা সিগারেট ওদের দিয়ে দিল। ওদের ভেতর যে লোকটা এতক্ষণ কথা বলেনি সে গনজালেসকে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা-পয়সার লেনদেন সম্পর্কে কথা হয়েছে?'

'না, এখনও হয়নি,' বলল গনজালেস, 'তবে ওসব নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। উনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু। টাকা-পয়সা যা দেবার যাওয়ার সময় দেবেন।' একদিন পর, রাতের খাওয়ার সময় সবাইকে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় আসতে বলল ও।

এরপর র‍্যাবেয়াকে বলল, 'বুড়ো খোকা, চিন্তার কিছু নেই। প্রথম রাতে আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

পরের দিন, হোটেলে নিজের ঘরে ফিরছে র‍্যাবেয়া। সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল তারিউ-এর সঙ্গে। 'আমার সঙ্গে যাবেন? ডাক্তার রিও-র কাছে যাচ্ছি,' বলল তারিউ।

একটু ইতস্তত করল র‍্যাবেয়া। 'যাওয়াটা কি উচিত হবে। আমার কেবলই মনে হয় ওকে নিশ্চয় খুব বিরক্ত করছি।'

'আপনি উতলা হবেন না। আপনার অনেক কথা শুনেছি ওর কাছে।'

কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করল র‍্যাবেয়া। তারপর বলল, 'তার চেয়ে এক কাজ করুন না বরং। রাতের খাওয়ার পর আমার এখানে দুজনেই চলে আসুন। একসঙ্গে গলা ভেজানো যাবে।'

'সেটা নির্ভর করছে ডাক্তার রিও-র ওপর।' দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে বলল তারিউ। 'আর প্লেগের ওপর তো বটেই।'

রাত এগারোটায় হোটেলের ছোট্ট বারে ঢুকল রিও এবং তারিউ। প্রায় তিরিশজনের মত লোক তখন বসেছিল ওখানে, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে কথা বলছে সবাই। আর বাইরে প্লেগ আক্রান্ত থমথমে শহর। কিছুটা থতমত খেয়ে গেল ওরা দুজন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঢোকার পথে। কিন্তু যখন দেখল বারে মদ বিক্রি হচ্ছে তখন হৈ-চৈ-এর কারণ বোধগম্য হলো।

এক কোণে একটা টুলের ওপর বসে আছে র‍্যাবেয়া। ওদের দেখেই ইশারা করল। আর পাশে দাঁড়ানো যে লোকটা হৈ-চৈ করছিল তাকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে সরাল ওদেরকে এগোনোর পথ করে দেয়ার জন্যে।

'কড়া কিছু টানতে আপত্তি নেই তো,' প্রস্তাব দিল ও।

'না,' সাড়া দিল তারিউ।

মদের ঝাঁঝাল গন্ধ শুঁকল রিও। চারদিকের চিৎকারে কারও কথা শোনা যাচ্ছে না। র‍্যাবেয়াকে দেখে মনে হচ্ছে মদ খাওয়া নিয়েই মগ্ন হয়ে আছে ও। বারের বাইরের অবশিষ্ট জায়গাটুকুতে দু'খানা টেবিল পাতা। একটায় বসে আছে একজন নৌবাহিনীর অফিসার, দু'পাশে দুজন যুবতী। সামনে বসা-লালচে-মুখো মোটাসোটা এক ভদ্রলোককে টাইফয়েড যেবার কায়রোতে মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল সে-গল্প শোনাচ্ছিল অফিসার। অন্য টেবিলটায় রয়েছে একদল যুবক। ঠিক ওদের মাথার ওপরেই লাউডস্পীকার থেকে ভেসে আসছে একঘেয়ে সঙ্গীতের গর্জন। তাই ওদের কথা শোনা যাচ্ছে না।

'কিছু হলো?' একটু চেঁচিয়ে র‍্যাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল রিও।

'সম্ভবত এই সপ্তাহের মধ্যে কিছু একটা হয়ে যাবে।'

'বড়ই দুঃখের কথা,' চিৎকার করে উঠল তারিউ।

'কেন? আপনি অমন ভাবছেন কেন?'

'না। না। এমনি,' বলল রিও, 'ওর ধারণা আপনি থাকলে আমাদের অনেক সাহায্য হত। কিন্তু আমি আপনার অবস্থা বুঝি।'

আর এক দফা মদ নিল ওরা। এবারের খরচটা তারিউ-এর।

টুল থেকে নেমে পড়ল র‍্যাবেয়া। এই প্রথম তারিউ-এর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কীভাবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

'কেন,' মদের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে শান্ত গলায় বলল তারিউ, 'আপনি আমাদের যে কোন একটা স্যানিটারি স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করতে পারেন।'

একটা একগুঁয়েমি ভাব ফুটে উঠল র‍্যাবেয়ার চেহারায়। আবার টুলে উঠে বসল ও।

'আপনার কি মনে হয়? স্কোয়াডগুলো ভাল কাজ করছে না?'

মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল তারিউ।

'না, একথা বলার মত কোন কারণ দেখছি না আমি।' র‍্যাবেয়া তার মদ শেষ করল।

রিও লক্ষ করল ওর হাত কাঁপছে। নিশ্চয় মাতাল হয়ে গেছে র‍্যাবেয়া।

পরের দিন স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় পৌঁছে র‍্যাবেয়া দেখল, সামনের ফুটপাথের ওপর অনেক লোক চেয়ার পেতে বসে আছে। চারপাশে সোনালি আর সবুজ আলো ঝিকমিক করছে। ওদের অনেকের মুখ থেকেই ভেসে আসছে কড়া চুরুটের ঝাঁঝাল গন্ধ। ভিড় ঠেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকল ও। ভেতরটা একেবারে খালি। সেদিন গনজালেস যে-টেবিলে বসেছিল সেদিকে এগিয়ে গেল র‍্যাবেয়া। পরিচারিকাকে জানাল, খাবারের ফরমাশ দিতে একটু দেরি হবে। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বাজে।

বাইরে যারা হাওয়া খাচ্ছিল ওদের মধ্যে থেকে দু'একজন করে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। টেবিলে ঘুরে ঘুরে খাবার দিতে লাগল পরিচারিকা। আস্তে আস্তে কোলাহলে ভরে উঠল ঘরটা।

আটটা বাজল। একে একে জ্বলে উঠল ভেতরের সবগুলো আলো। ওর টেবিলের চারপাশের চেয়ার দখল করে বসল অপরিচিত একদল লোক। ডিনারের ফরমাশ দিল র‍্যাবেয়া।

সাড়ে আটটায় ওর খাওয়া শেষ হবার পরও গনজালেস বা সেই পাহারাদার দুজনের কেউ এল না। আস্তে আস্তে খালি হতে আরম্ভ করল রেস্তোরাঁ। ন'টায় একেবারে খালি হয়ে গেল। পরিচারিকা অদ্ভুতদৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে। দেখে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল র‍্যাবেয়া।

রাস্তার ও-পারে তখনও একটা কাফে খোলা ছিল। সেখানে ঢুকে এমন একটা জায়গা বেছে নিল ও, যেখান থেকে স্প্যানিশ

রেস্তোরাঁর দরজার ওপর ভালভাবে নজর রাখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ এল না। রাত সাড়ে ন'টায় রাস্তায় বেরিয়ে নিজের হোটেলের দিকে ধীর পায়ে হাঁটা দিল র‍্যাবেয়া।

গনজালেস-এর ঠিকানা ও রাখেনি। লোকটাকে আবার কীভাবে খুঁজে বের করবে সেটাই এখন ওর চিন্তার বিষয়। হয়তো আবার গোড়া থেকেই সবকিছু শুরু করতে হবে।

ওর চারপাশ দিয়ে ছুটোছুটি করছে অ্যাম্বুলেন্স। একসময় হঠাৎ র‍্যাবেয়া সবিস্ময়ে অনুভব করল, ওর আর ওর প্রেমিকার মাঝখানে প্লেগ যে-দেয়াল তুলেছে, সেই দেয়ালের বাইরে যাবার সমস্ত পথ ওর জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। অকস্মাৎ প্রেমিকাকে দেখার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ওর হৃদয়ে প্রচণ্ড গতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শুরু হলো জ্বালা। দাবানলের মত শিরা-উপশিরা বেয়ে রক্ত প্রবাহের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। হোটেলের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল র‍্যাবেয়া।

পরের দিন খুব সকালে রিও-র বাসায় গেল ও। জানতে চাইল কটার্ডকে কোথায় পাওয়া যাবে।

'কাল রাত দশটায় কটার্ড-এর এখানে আসার কথা। তারিউ আসতে বলেছে। আপনি সাড়ে দশটায় আসুন,' বলল রিও।

পরের দিন রাতে কটার্ড পৌঁছে দেখে রিও এবং তারিউ একজন রোগীর ব্যাপারে আলাপ করছে। ওরা ভেবেছিল লোকটা মারা যাবে, কিন্তু সে বেঁচে আছে এখনও। রিও এরপর বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারিউ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কটার্ড-এর দিকে।

'মসিয়ে কটার্ড, বলুন তো, আপনি কেন এখনও আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন না?'

কটার্ড টুপি হাতে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বোঝাই যায়

আঁতে ঘা লেগেছে তার। 'এগুলো আমার কাজ বলে আমি মনে করি না। আর তাছাড়া, প্লেগের ফলে আমার কিছু সুবিধাই হয়েছে। তাই আমি একে বাধা দিতে চাই না।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। প্লেগ শুরু না হলে আপনাকে অনেক আগেই হাজতে যেতে হত।'

ভীষণ চমকে উঠল কটার্ড। চেয়ারের পিছনটা ধরে সামলে নিল নিজেকে। 'কে বলেছে আপনাকে এ-কথা?'

'কেন, আপনি নিজেই বলেছিলেন। ভুলে গেছেন এরই মধ্যে?'

মানসিক ভারসাম্য হারাল কটার্ড। অশ্রাব্য গালিগালাজ আরম্ভ করল ও।

'দেখুন, অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই,' শান্ত গলায় বলল তারিউ, 'আমি কিংবা রিও, আমরা কেউই পুলিসের কাছে আপনার কথা জানাব না। আর আপনি কী করেন না করেন তা নিয়েও আমাদের মাথাব্যথা নেই। শান্ত হন, বসুন।'

ইতস্তত করে বসে পড়ল কটার্ড। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘনিশ্বাস।

'আমার একটা পুরনো ব্যাপার আবার ঘুঁচিয়ে তোলা হয়েছে। ভেবেছিলাম সবাই এতদিনে ভুলে গেছে ওটা। থানা থেকে কয়েকদিন আগে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। আমাকে জানানো হয়, ব্যাপারটার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন এক পা-ও না নড়ি কোথাও। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে ধরবেই।'

'গুরুতর কিছু?' জানতে চাইল তারিউ।

'গুরুতর বলতে আপনি কী বোঝেন সেটা না জানলে কী বলব বলুন? তবে খুন বা ওই ধরনের কিছু নয়।'

কটার্ডকে দেখে রিও আর তারিউ উভয়েরই করুণা হলো ভীষণ। 'ভাগ্য ভাল হলে শুধু হাজতবাসের ওপর দিয়েই পার পেয়ে

যেতে পারি।' হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। 'একটা ভুলের জন্যে ব্যাপারটা ঘটেছিল। ভুল তো সবাই করে, করে না? কিন্তু তারই জন্যে শাস্তি পেতে হবে আমাকে?'

'তাহলে এজন্যেই আপনি গলায় দড়ি দিয়েছিলেন?' আবার প্রশ্ন করল তারিউ।

'হ্যাঁ। তবে সেটাও একটা ভুল ছিল।'

কটার্ডকে আশ্বাস দিল রিও। বলল, 'আপনার ব্যাপারটা এতদিনে বুঝতে পারলাম। আমার বিশ্বাস আপনার কোন বিপদ হবে না।'

'তা আমিও জানি। এ-মুহূর্তে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'এতক্ষণে বুঝলাম কেন আপনি আমাদের কাজে যোগ দিচ্ছেন না,' বলল তারিউ।

'মসিয়ে তারিউ, আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয় আপনার কোন আক্রোশ নেই?'

'অবশ্যই না। তবে একটাই অনুরোধ, চারদিকে এই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে বেড়াবেন না।'

কটার্ড প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি নিজে কোন দিন এটা চাইনি। প্লেগ শুরু হয়েছে, সেটা দৈব ব্যাপার। এর জন্যে কিছু ব্যক্তিগত সুবিধা আমার হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা আমার বরাত। তাই বলে প্লেগের জন্যে আমাকে দায়ী করা উচিত নয়।' কথাবার্তায় মনে হলো ইতিমধ্যে বেশ সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে ও। এমন সময় ওখানে ঢুকল র‍্যাঁবেয়া। ওকে দেখে আবার ফুঁসে উঠল কটার্ড। রীতিমত চিৎকার করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না, আপনারা যে-সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে কোন ফল হবে।'

র‍্যাঁবেয়া কটার্ডকে প্রশ্ন করে জানল, গনজালেস-এর ঠিকানা ও জানে না। শুনে বিরক্তি আর হতাশায় ভরে উঠল ওর মন। এরপর

কটার্ডকে সে বলল, 'সেই ছোট্ট কাফেটাতে আমরা আর একবার গেলে কেমন হয়?' ঠিক হলো পরের দিন ওরা যাবে সেখানে।

রিও র‍্যাবেয়াকে বলল, 'আপনার কী হলো সে-খবর কিন্তু আমাকে দিতে ভুলবেন না।'

র‍্যাবেয়া জানাল, 'আপনি এবং তারিউ যদি এ-সপ্তাহের শেষে হোটেলে এসে আমার খোঁজ নেন, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। বেশি রাত হলেও অসুবিধে হবে না, আমি আমার ঘরেই থাকব।'

পরের দিন সকালে সেই ছোট্ট কাফেটাতে গেল র‍্যাবেয়া এবং কটার্ড। বলে এল, আজ সন্ধ্যায় অথবা কাল সকালে যেন গ্রাসিয়া ওদের সঙ্গে কাফেতে দেখা করে। সেদিন সন্ধ্যায় ওদের অপেক্ষা বৃথা গেল। পরের দিন এল গ্রাসিয়া। সবকিছু শুনে বলল, 'কী ঘটেছে আমি ঠিক জানি না। শুনেছিলাম, শহরের কয়েকটা অঞ্চল ঘেরাও করা হয়েছিল। প্রতিটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। হয়তো ওরা এই ঘেরাও থেকে ঠিকমত পালাতে পারেনি। আমি রাউল-এর সঙ্গে আবার আপনাদের দেখা করিয়ে দিতে পারি। তবে পরশুর আগে সময় করে উঠতে পারব না।'

পরের দিন এক রাস্তার মোড়ে হঠাৎ করেই রাউল-এর সঙ্গে দেখা হলো র‍্যাবেয়ার। শুনল, গ্রাসিয়ার অনুমান ঠিক। শহরের নিচু এলাকাগুলো এখনও ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। এরপর ওদের কাজ হলো গনজালেস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা। দুদিন পর স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়ার সময় ফুটবলারের সঙ্গে দেখা হলো র‍্যাবেয়া-র।

'না, এটা বোকামি হয়ে গেছে,' গনজালেস জানাল, 'আপনার অবশ্যই উচিত ছিল ওদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা।'

নিজের ভুল স্বীকার করল র‍্যাবেয়া। 'যেভাবে হোক কাল

সকালে ছোকরা দুটোকে খুঁজে বের করব,' বলল গনজালেস, 'তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।'

পরের দিন ওরা গিয়ে দেখে দুই পাহারাদার আগেই বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা চিরকুটে লিখে রেখে গেছে, পরদিন দুপুর বেলা হাইস্কুলের মাঠে দেখা করবে।

র‍্যাবেয়া হোটেলে ফেরার পর ওর চেহারা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তারিউ।

'আপনার শরীর ভাল তো?' প্রশ্ন না করে পারল না ও।

'না, শরীর ঠিক আছে। কিন্তু কাজটা আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, এটা ভেবেই মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে আপনারা আসছেন তো?'

রাতে রিও এবং তারিউ ঘরে ঢুকে দেখে বিছানায় শুয়ে আছে র‍্যাবেয়া। ওদের দেখেই বিছানা ছেড়ে সামনের সাজানো গ্লাসগুলোয় মদ ঢালল ও।

গ্লাসে চুমুক দেবার আগে রিও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কতদূর এগুলো?'

র‍্যাবেয়া বলল, 'সবকিছু প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। হয়তো দু-একদিনের মধ্যে শেষ পর্যায়ের দেখা-সাক্ষাৎ হবে।' এরপর নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে হতাশ কণ্ঠে মন্তব্য করল, 'হয়তো ঠিক সময়ে দেখা যাবে ওরা আসেনি।'

'এ কথা ভাবছেন কেন? একবার হয়েছে বলে এবারও অমন হবে, তার কোন মানে নেই।'

'তাহলে আপনি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল র‍্যাবেয়া।

'মানে?'

'প্লেগ। প্লেগের কথা বলছি।'

'আচ্ছা?' চেঁচিয়ে উঠল রিও।

'হ্যাঁ। আপনি এর চরিত্র এখনও বুঝতে পারেননি। এর অর্থ হচ্ছে, একই জিনিসের বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়া।' র‍্যাবেয়া উঠে ঘরের কোণে একটা ছোট গ্রামোফোন চালিয়ে দিল। এমন সময় বাইরে শোনা গেল গুলির আওয়াজ।

'কুকুর মারা পড়ল, নাকি কেউ পালিয়ে যাচ্ছিল?'

কয়েক মিনিট পর থেমে গেল রেকর্ড। জানালার নিচে, রাস্তায় শোনা গেল অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ। আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

'কেমন বিরক্তিকর ওই রেকর্ড,' মন্তব্য করল র‍্যাবেয়া, 'তবু আজ এই নিয়ে দশবার বাজালাম।'

'এত ভাল লাগে?'

'ভাল লাগার তো কথা নয়। কিন্তু আছে যে মাত্র একটাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারিউ বলল, 'তাহলে ব্যাপার ওটাই। একই জিনিস বারবার ঘটে।'

রিওকে জিজ্ঞেস করল র‍্যাবেয়া, 'আপনাদের স্যানিটারি স্কোয়াড কেমন কাজ করছে?'

'আপাতত পাঁচটা দল কাজ করছে। আশা করছি শিগ্‌গিরই এদের সংখ্যা বাড়বে।'

'ডাক্তার, এসব নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। এখনও আমি কেন যোগ দিইনি, তার কারণ আছে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে আমার ভয় নেই। আমি স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম।'

'কোন্ পক্ষে?' প্রশ্ন করল তারিউ।

'যে পক্ষকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। আমি মনে করি, মহৎ কিছু করার ক্ষমতা সব মানুষেরই আছে। কিন্তু মহৎ অনুভূতি যার নেই তাদের কাছে যেতে আমার মন সাড়া দেয় না।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় সবকিছুই হয়তো আমরা করতে পারি,' মন্তব্য করল তারিউ।

'না, এটা ঠিক নয়। মানুষ একটানা যেমন দুঃখভোগ করতে পারে না, তেমনি সুখভোগও করতে পারে না। এর অর্থ, সত্যিকারের মহৎ বা মূল্যবান কাজ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।'

র‍্যাবেয়া ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তারিউ, আপনি কী ভালবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারবেন?'

'বলা কঠিন। কিন্তু এ-মুহূর্তে পারব না।'

'তাহলে দেখুন। অথচ প্লেগের জন্যে প্রাণ দেবার সাহস আপনার আছে। কিন্তু আমি দেখতে চাই মানুষ শুধু ভালবাসার জন্যেই বাঁচবে কিংবা মরবে। এখন এতেই আমার আগ্রহ।'

রিও উঠে বলল, 'আমরা এখন যা করছি সে-সবের ভেতর সত্যি কোন বীরত্ব নেই। অন্তত আমরা সে-ভাবে চিন্তা করি না। আমাদের এই কাজের পিছনে আছে একটি সাধারণ অনুভূতি, যার নাম শালীনতাবোধ।'

'কিন্তু শালীনতাবোধটা আসলে কী?' র‍্যাবেয়ার গলার স্বর বেশ গম্ভীর মনে হলো এবার।

'নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা।'

'নিজের দায়িত্ব? কিন্তু হায়, আমি যদি জানতে পারতাম কোনটা আমার নিজের দায়িত্ব। জানি না, ভালবাসাকে মানুষের জীবনে এতটা গুরুত্ব দিয়ে আমি ভুল করেছি কিনা!'

'না, না, তা ভাবছেন কেন? আপনি মোটেই ভুল করেননি।'

'আমার ধারণা এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনাদের দুজনের কারোরই সত্যিকারের হারাবার কিছু নেই। তাই এই পথে যেতে আপনাদের বাধাও নেই।'

রিও গ্লাসের বাকি মদটুকু খেয়ে তারিউকে বলল, 'চলুন,

আমাদের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

ওকে অনুসরণ করল তারিউ। কিন্তু দরজায় পৌঁছে থেমে গেল ও। ঘুরে র‍্যাঁবেয়াকে বলল, 'আপনি হয়তো জানেন না, রিও-র স্ত্রী এখন এক স্যানাটোরিয়ামে আছেন, চিকিৎসা চলছে ওর। এখান থেকে শ'খানেক মাইল দূরে ওই স্বাস্থ্যনিবাস।'

হঠাৎ থ হয়ে গেল র‍্যাঁবেয়া। কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে গেছে তারিউ।

পরের দিন খুব সকালে রিওকে ফোন করল র‍্যাঁবেয়া, 'শহর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আপনারা রাজি?'

এক মিনিটের মত কেটে গেল নীরবে। এরপর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল রিও, 'অবশ্যই, র‍্যাঁবেয়া। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

তৃতীয় পর্ব

এক

অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ে আশেপাশের সবকিছু এমনকি শহরের প্রতিটি মানুষের জীবনও গ্রাস করে ফেলল প্লেগ। একদিন উঠল প্রচণ্ড ঝড়, এবং প্লেগ-উপদ্রুত শহরের ওপর দিয়ে বয়ে চলল সেই ঝড়। ওরাওঁ-এর অধিবাসীরা ঝড়কে ভীষণ ভয় পায়, কেননা ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ঝড়ের গতিপথে বাধা দেয়ার মত প্রাকৃতিক কোন প্রতিবন্ধক নেই শহরে। গত কয়েক মাস ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় সবকিছুর ওপর ধুলোর একটা পুরু আস্তর জমে উঠেছিল। ঝড়ে সেগুলো হালকা মেঘের মত ওপরে উঠে উড়তে লাগল বাতাসের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল ধুলার ধূসর মেঘে। মানুষের চারপাশে ঘুরতে লাগল অসংখ্য কাগজের টুকরো। এই দুই কারণে ক্রমেই জনশূন্য হয়ে পড়তে লাগল রাস্তাঘাট। কদাচিৎ কেউ বেরোলেও, রুমাল বা হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তড়িঘড়ি হাঁটছে। রাত নামলে আগে যেমন চারদিকে মানুষের সমাগম হত, নিজেদের তারা ডুবিয়ে দিত আনন্দ ফুর্তির ভেতর, এখন আর তেমন কিছু চোখে পড়ে না। এখন জনশূন্য রাস্তায় ঝড়ের একটানা ক্রুদ্ধ ফোঁসফোঁসানি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ঝড়ে আন্দোলিত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র

থেকে ভেসে আসে লবণাক্ত পানি আর পচা আগাছার গন্ধ। শহরটাকে মনে হয় অভিশপ্ত মানুষের বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ।

এতদিন প্লেগ তার শিকার খুঁজছে শহরতলির ঘিঞ্জি অঞ্চলে। কিন্তু এবার হামলা চালাল বাণিজ্যিক এলাকাগুলোয়, এবং সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে জাঁকিয়ে বসল। মানুষ বলল, বাতাস রোগের সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, এইসব এলাকাকে শহরের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলা হবে, হাতে গোনা কিছু লোককে ছাড়া কাউকে আর বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া হবে না।

ঠিক এই সময় থেকে পশ্চিম ফটক সংলগ্ন অঞ্চলগুলোয় আগুন লাগাটা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল যে সব মানুষকে সংক্রমণ এলাকার বাইরে রাখা হয়েছিল তাদের কেউ কেউ সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল, এবং তারাই এইসব আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্রিয়জন বিয়োগের শোকে এরা মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। ভাবছে, আগুন জ্বালিয়ে প্লেগের জীবাণু মেরে ফেলা যাবে। শহরে ঝড় বইতে থাকায় এই আগুন মানুষের মনে এক ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ এই অপরাধের জন্যে কঠোর শাস্তির বিধান জারি করলেন। শেষে ওই অপ্রকৃতিস্থ লোকগুলো শান্ত হয়ে এল। অবশ্য ওরা যে হাজতবাসের ভয়ে এই কাজ ছাড়ল, তা নয়। জেলখানায়ও এখন মৃত্যুর হার অকস্মাৎ বেড়ে গিয়েছে, বস্তুত এই ভয়েই কেউ জেলে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না।

যেসব মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে–যেমন সৈনিক, কয়েদি, পাদ্রি এবং নান–প্লেগ প্রথমে তাদেরকেই আক্রমণ করে। জেলখানাগুলোয় সাধারণ কয়েদি মারা পড়ছে যে পরিমাণে,

ওয়ার্ডাররাও পটল তুলছে সেইভাবে। প্লেগের কাছে ছোট-বড় কোনরকম ভেদাভেদ নেই। শহরে যে দুটো মঠ আছে, সেখান থেকে ধর্মযাজকদের সরিয়ে এনে ধার্মিক কিছু পরিবারের সঙ্গে সাময়িকভাবে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করা হলো। ব্যারাক থেকেও কিছু সৈনিককে নিয়ে এসে রাখা হলো বিভিন্ন স্কুল এবং সরকারি অফিসে।

এইসব পরিবর্তন এবং একটানা ঝড়ো হাওয়ার কারণে কারও কারও মনে দেখা দিল দাঙ্গাবাজ মনোভাব। শহরের বিভিন্ন ফটকে প্রায়ই হামলা হতে লাগল। যারা আক্রমণ করে তাদের হাতে থাকে অস্ত্র। দুপক্ষের ভেতর রীতিমত গুলি বিনিময় হয়। তাই বাড়িয়ে দেয়া হলো গার্ডপোস্টের সংখ্যা। এর ফলে আস্তে আস্তে আক্রমণও থেমে গেল।

ফটকে আক্রমণ থেমে গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পর থেকে ছোট আকারে বল প্রয়োগের ঘটনা আরম্ভ হয়ে গেল। স্যানিটারি কর্তৃপক্ষ যে-সব বাড়ি সাময়িকভাবে বন্ধ করে রেখেছিলেন, সেসব বাড়িতে লুটতরাজ শুরু হলো। সাময়িক উত্তেজনার ঝোঁকে এইসব কাজে মেতে উঠল মানুষ। মাঝে মাঝে আজকাল হতবাক হয়ে যাবার মত দৃশ্য চোখে পড়ে। হয়তো একটি বাড়ি দাউদাউ আগুনে জ্বলছে, পাশে দাঁড়িয়ে শোকে দুঃখে মুহ্যমান মালিক তাকিয়ে আছেন আগুনের লেলিহান শিখার দিকে; এমন সময় কেউ সাময়িক উত্তেজনায় ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ে সেই জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর। আশেপাশের অনেক দর্শক তখন সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পিছু নেয় লোকটার। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, অন্ধকার রাস্তা জুড়ে অসংখ্য মানুষ দাপাদাপি করছে; তাদের মাথার ওপর অথবা কাঁধে সংসারের আসবাবপত্র।

কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন জারি করতে বাধ্য হলেন। একদিন

লুণ্ঠনে ব্যস্ত দুজন লোককে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করা হলো। রাত এগারোটা থেকে বলবৎ করা হয় সান্ধ্য-আইন। অন্ধকারে নিমজ্জিত ওরাওঁ শহরকে তখন মনে হয় একটা বিশাল কবরস্থান। চারদিকে কোথাও পায়ের শব্দ কিংবা কুকুরের ডাক শোনা যায় না। সবখানে কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। শহরের দীর্ঘ রাস্তা আর তার দুপাশের আধা-মলিন দেয়াল, মনে হয় যেন সামনের দিকে যেতে যেতে এক সময় হঠাৎ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। মোড়ে মোড়ে যেসব জাঁদরেল মহাপুরুষের প্রস্তর মূর্তি আছে, মনে হয় প্রাণহীন এই শহরে তারাই এখন একমাত্র প্রতিনিধি।

এখন প্লেগে কারও মৃত্যু হওয়ার অর্থ, সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে তার পরিবারের সবার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। লাশের পাশে আত্মীয়-স্বজনের আসা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় মারা গেলে সারারাত ধরে কেউ আর তার শিয়রে বসে থাকে না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকে শব। আর রাতে মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। যারা পরিবারের সঙ্গে বাস করা অবস্থায় মারা যায়, সেসব পরিবারকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। আর যেসব রোগী আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে মারা যায়, তাদের বেলায় পরিবারপরিজনদের লাশ দেখার সুযোগ দেয়া হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ে–গোসল করানোর সময়। এই আনুষ্ঠানিকতাগুলো ঘটে, ধরে নেয়া যাক, রিও-র অস্থায়ী হাসপাতালে। যে-স্কুল ভবনকে এই হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তার পিছনের দিকে বাইরে বের হবার একটা পথ আছে। কফিনে শোয়ানো লাশটা রাখা হয় বড় একটা গুদাম ঘরে। মৃত ব্যক্তির আপনজনেরা এসে দেখতে পায় আগেই পথের ধারে পেরেক মারা কফিন নামিয়ে রাখা হয়েছে। তারা সই দেন

কতকগুলো সরকারি কাগজপত্রে। এরপর কফিনটাকে তুলে দেয়া হয় কোন শবযান বা অ্যাম্বুলেন্সে। অপেক্ষমাণ কোন ট্যাক্সিতে গিয়ে ঢোকে শোকাচ্ছন্ন পরিবারের লোকজন। শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে পাশ কাটিয়ে অন্য একটা পথ ধরে কবরস্থানের দিকে ছুটে যায় শবযান। শহরের বাইরে যাবার ফটকে পৌঁছে থামে সবাই। একজন পুলিস অফিসার বাইরে যাবার অনুমতিপত্রের ওপর সীলমোহর লাগিয়ে দেন। কিছুক্ষণ চলার পর আবার থেমে পড়ে শবযান। এটাই কবরস্থান। আগেই কবর খুঁড়ে রাখা হয়। ওদের দেখে এগিয়ে আসেন একজন পাদ্রি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় শবকে গির্জায় নিয়ে যাবার চিরন্তন রীতি এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কফিন শবযান থেকে নামিয়ে কবরের পাশে রাখা হয়। দড়ি খুলে দিতেই সশব্দে গর্তে পড়ে যায় লাশ। কবরের ওপর মন্ত্রপূত পানি ছিটিয়ে দেন ধর্মযাজক। শবযান আগেই চলে যায়। কবর ভরাট হতে না হতেই ট্যাক্সিতে গিয়ে ওঠে আত্মীয়স্বজন। পনেরো মিনিটের ভেতর বাসায় ফিরে যায় সবাই।

অর্থাৎ, গোটা ব্যাপারটাই সম্পন্ন হয়ে যায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অথচ প্রায় ঝুঁকিহীনভাবে। স্বাভাবিকভাবেই, এরকম বিদ্যুৎগতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে ফেলার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শুরুতে মৃত ব্যক্তির পরিবারের অনেকেই ক্ষুব্ধ হলো মনে মনে। কিন্তু এটাও ঠিক প্লেগের মত ভয়াবহ একটা সঙ্কট মোকাবিলায় তুচ্ছ ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিলে চলে না, এবং সেজন্যেই জলাঞ্জলি দেয়া হলো আর সব মানবিক অনুভূতিকে। এর ফলে শহরবাসীদের কারও কারও মনোবলও ভেঙে পড়ল। তবে সৌভাগ্যক্রমে, ঠিক সে-সময়ে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় সবার নজর পড়ল গিয়ে আশু সমস্যার দিকে। বিভিন্ন রকমের ফরম পূরণ করা, কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যাবে তা খুঁজে দেখা, প্রতিদিন দোকানের সামনে

লাইন দেয়া–এইসব কাজে এত সময় নষ্ট হতে লাগল যে, এরপরে আশেপাশে কে কোথায় কিভাবে মরছে বা নিজেদেরও একদিন কিভাবে মরতে হবে–এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবসরই আর পেল না কেউ।

যতই দিন যেতে লাগল, দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে লাগল কফিন, কাফনের কাপড় আর গোরস্থানে কবর দেয়ার জায়গা। এবার, অগত্যা, ঠিক করা হলো, একগর্তে যত বেশি সম্ভব লাশকে দাফন করা হবে।

রিও-র হাসপাতালে কফিনের মজুত নেমে এল পাঁচে। সেগুলো যখন ভর্তি হয়ে গেল, একসঙ্গে তুলে দেয়া হলো অ্যাম্বুলেন্সে। কবরস্থানে পৌঁছার পর লাশগুলো বের করা হলো বাক্স থেকে, তারপর স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো কাছেরই একটা চালাঘরে। আরও কিছু লাশ আসার পর একসঙ্গে কবর দেয়া হবে, সে-পর্যন্ত এখানেই থাকবে এগুলো। এরপর শূন্য কফিনগুলোয় জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটিয়ে আবার সেগুলো ফেরত পাঠানো হলো হাসপাতালে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মকানুনেও রদবদল করা হলো কিছু। কবরস্থানের পিছনের একটা খোলা জায়গায় দুটো প্রকাণ্ড গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। এর চারপাশে আছে গাছের সারি। একটা গর্ত রাখা হলো পুরুষদের জন্যে, অন্যটা মেয়েদের। কিছু জায়গায় সমস্যা দেখা দেয়ায় এখন থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নিক্ষেপ করা হতে লাগল ওই গর্ত দুটোয়। এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন যাতে মনোকষ্ট না পায় সেজন্যে আইন জারি করা হলো, কবর দেয়ার সময় কর্তৃপক্ষীয় লোকজন ছাড়া অন্য কেউ ওখানে উপস্থিত থাকতে পারবে না। আত্মীয়স্বজন শুধুমাত্র কবরখানার ফটক পর্যন্ত যেতে পারবে।

তবে, স্ত্রী পুরুষকে আলাদাভাবে শনাক্ত করার ব্যবস্থা বলবৎ রইল এখনও, এবং কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। প্রতিটা গর্তের তলায় চুন ছিটিয়ে একটা পুরু আস্তরণ তৈরি করা হলো, সেখান থেকে সব সময় ধোঁয়া ওঠে। অনেকগুলো লাশ একসঙ্গে গর্তে নামানোর পর তাদের ওপর ছিটিয়ে দেয়া হয় আর এক প্রস্থ চুন আর এর ওপরে সামান্য মাটি, তবে কখনোই ইঞ্চি কয়েকের বেশি পুরু নয় যাতে পরে আরও লাশ এলে সেগুলোকে এর ওপর শোয়ানো যায়। পরদিন, আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্যে যে রেজিস্টার আছে সেটা সই করিয়ে নেয়া হয়–যাতে মানুষ এবং অন্য কিছু, ধরা যাক, কুকুরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। মানুষের মৃত্যু খাতায় লিপিবদ্ধ করা হত।

কাজকর্মের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় অনেক লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল, অথচ রিওকে সাহায্য করার মত মানুষের তখন ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছে। গোরখোদক, স্ট্রেচার বাহক, এবং এই ধরনের ছোটখাট কাজের জন্যে অন্যান্য যেসব সরকারি কর্মচারি থাকে প্রথম তারা এবং পরে স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। যত কঠোর সাবধানতাই অবলম্বন করা হোক না কেন, দুদিন আগে বা পরে, ছোঁয়াচে ঠিকই তার থাবা বসাল।

অবশ্য মহামারী আরও ভয়াবহ রূপ নেয়ার ফলে রোগ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন লোক পাওয়াটা একটু সহজ হলো। শহরের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় অনেকেই বেকার হয়ে পড়ল। ফলে, ভয়ের চেয়ে দারিদ্র্যই এখন থেকে অধিকতর শক্তিশালী তাড়না হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, এবং বিশেষ করে, মুর্দা দাফনের কাজে ঝুঁকি থাকায়, মজুরি বেশি দেয়া হয় বলে, এ

ধরনের 'তুচ্ছ কাজের' লোকের সমাগম গেল বেড়ে।

অগাস্ট মাস পর্যন্ত মৃতদের কবরস্থানে নেয়ার জন্যে মানুষের কোন অভাব হলো না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য চেহারায়। এরপর মৃত্যুর হার হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেল, এবং এ অবস্থাই বজায় রইল। ছোট কবরস্থানটায় এত লাশের জায়গা দেয়া এবার সত্যিই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কবরস্থানের চারপাশের দেয়ালগুলো ভেঙে আশেপাশের জমিতেও কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো, কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হলো না।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে শুধুমাত্র রাতের বেলায় কবর দেয়া চালু হলো। এর ফলে সম্ভব হলো দাফনের শিষ্টাচারগুলোকে কমিয়ে ফেলা। এবার নিয়ম হলো, সবগুলো মৃতুদেহকে ঠেসে তুলে দেয়া হবে একটা অ্যাম্বুলেন্সে। রাতে ঘোরাফেরা যাদের অভ্যাস, হামেশাই পরিচিত একটা দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল তাদের। সাদা অ্যাম্বুলেন্স বোঝার ভারে এগিয়ে চলেছে টলতে টলতে। আশেপাশের রাস্তায় শোনা যায় তাদের একঘেয়ে ঢং ঢং আওয়াজ। গোরস্থানে পৌঁছানোর পর, মৃতুদেহগুলোকে কোনরকমে গর্তের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়। গর্তের নিচে সেগুলো ঠিকমত পাশাপাশি পড়ল কিনা সেটা দেখার অবকাশও তখন থাকে না কারও। তারপর কোদালে কোদালে চুন ছিটানো হয় লাশগুলোর ওপর, সঙ্গে সঙ্গে মৃত মুখগুলো ঝলসে বিকৃত হয়ে যায়। এরপর ওদের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয় মাটি। অনেক সময় লাশগুলো ঠিকমত ঢাকাও পড়ে না। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই ভরাট হতে থাকল অগণিত কবর। ফলে দেখা দিল আর এক সমস্যা।

কর্তৃপক্ষ এবার সিদ্ধান্ত নিলেন পুরানো যত কবর আছে, খালি করতে হবে। গলিত দেহাবশেষগুলোকে কবর থেকে তুলে পাঠানো

হলো শ্মশানে। আর সেই থেকে, প্লেগে মরা লাশগুলোকে সরাসরি শ্মশানে পাঠানো হতে লাগল। সেখানে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় ওদের। ওরাওঁ-এ একটাই শ্মশান আছে, শহরের পুব ফটকের বাইরে। শ্মশান ব্যবহারের সুবিধার্থে, পুব ফটকের গার্ডপোস্টটাকে আগের জায়গা থেকে খানিকটা তফাতে সরিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শ্মশানে পৌঁছানোর যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে।

এ-সময় এক মিউনিসিপ্যাল কর্মচারির মাথা থেকে অভিনব এক বুদ্ধি বের হলো, এবং এর ফলে কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সাগর-উপকূলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী ট্রাম লাইনটা এতদিন অকেজো অবস্থায় পড়েছিল; ওই কর্মচারি সেটাকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিল।

নয়া উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজনীয় রদবদল করা হলো ট্রামগুলোকে। ছোট ছোট ট্রলির ভেতরটাও বদলে ফেলা হলো যথাসম্ভব। শ্মশানে যাওয়ার জন্যে নতুন একটা লাইনও খোলা হলো। এখন থেকে ট্রাম আর ট্রলির গন্তব্য হলো ওই শ্মশান।

সেবার গ্রীষ্মের শেষের দিকে এবং সারাটা শরৎকাল ধরে প্রতিদিন একই দৃশ্য চোখে পড়ল সকলের। সাগর-উপকূল থেকে খাড়া ওপরে উঠে গেছে যে-পাহাড়ের চূড়া আর তার চারপাশের ঘোরানো রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে অবিরাম ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত সব ট্রাম, যাত্রীশূন্য অবস্থায়। কিন্তু অল্পকিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল। তখন থেকে কিছু কিছু লোক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে লুকিয়ে থাকতে শুরু করল পাহাড়ের আশেপাশে। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকা সত্ত্বেও এটা বন্ধ করা সম্ভব হলো না। ট্রামগুলো যখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগোয়, তখন ওরা আড়াল থেকে ট্রামের ওপর

ছুঁড়ে দেয় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। এ-ভাবে মৃতদেহ আর ফুলে ভর্তি ট্রামগুলো গ্রীষ্মের উত্তপ্ত অন্ধকারে একটানা ঝপঝপ শব্দ করতে করতে একটার পর একটা চলে যায় শ্মশানে।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রকৃতিও উন্মত্ত হয়ে উঠল। শহরের পুব আকাশে এবার দেখা দিল ধোঁয়াটে বিশ্রী গন্ধভরা তেলতেলে একটা আনত মেঘ। ডাক্তাররা বলল গন্ধটা বিশ্রী হলেও এই মেঘ স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষরা ধরে নিল ওই মেঘ সারাক্ষণ ওদের ভেতর রোগের জীবাণু ছড়াচ্ছে। ওরা কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখাল, কেউই এ-অঞ্চলে থাকবে না। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ মেঘটাকে সরানোর নানারকম যন্ত্রপাতি বসাবার আয়োজন করলেন। এরপর দেখা গেল যখন জোরে বাতাস বয়, পুবদিক থেকে একটা আঠাল গন্ধ ভেসে আসে; আর শহরবাসীদের তখন মনে পড়ে যায় ওরা এখন নতুন এক পরিবেশে বাস করছে, যার নাম প্লেগ।

কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে লাশগুলোকে সরাসরি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হবে। এটা ভাবতেই রিও-র চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দৃশ্য: পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে বীভৎস চেহারার সব শব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যাই ভাবুন, মৃত্যুর হার আর একটু বাড়লে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। হয়তো গাদা গাদা মানুষ মরে রাস্তায় পচতে শুরু করবে। অথবা হয়তো শহরের এমন দৃশ্যও চোখে পড়বে: মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ ঘৃণা কিংবা আশায় জীবিত মানুষদের জড়িয়ে ধরার জন্যে অধীর আগ্রহে ছুটছে।

চতুর্থ পর্ব

এক

সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসে ওরাওঁকে দেখে মনে হলো শহরটা মহামারীর হাতে এক অসহায় শিকার; উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে প্লেগের পায়ের সামনে। প্লেগের দয়া আর করুণাই এখন তার একমাত্র ভারসা। মানুষের কাছে সপ্তাহগুলো মনে হলো অনন্তকালের মত। দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি; শূন্যে অনেক উঁচুতে উড়তে লাগল নিঃশব্দে, যেন, শহরবাসীদের ছাতের উপর ঘূর্ণায়মান প্লেগের সেই যে বিশাল শস্য মাড়াইয়ের দণ্ডের কথা বলেছিলেন ফাদার প্যানালু, সেই দণ্ডটি এই শহর সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছে ওদের। অক্টোবরের শুরুতে এক প্রবল বর্ষণের ফলে রাস্তা ঘাট ধুয়ে মুছে ঝকঝক করতে লাগল আবার।

রিও এবং ওর বন্ধুরা এতদিনে এই প্রথম অনুভব করল ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। রিও লক্ষ করল সব ব্যাপারে কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠেছে সবাই।

প্লেগের সংক্রমণ যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সুস্থ লোকদের আলাদা করে রাখার জন্যে কিছু কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। এ-রকম একটা কেন্দ্র দেখাশোনার ভার দেয়া হয়েছিল র‍্যাঁবেয়া-র ওপর। ও যে হোটেলে থাকে সেটাও এই উদ্দেশ্যে দখল করে নেয়া

হয়েছিল।

দিনরাত কাজ করার পর এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সবাই, বাসায় ফিরে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাবার বা রেডিও শোনার ধৈর্যটুকুও কারও থাকে না। প্লেগ থেকে কেউ কেউ সেরে উঠছে, এ-ধরনের খবর শুনলে ওরা মানুষের সামনে কিছুটা আগ্রহ দেখানোর ভান করে বটে, কিন্তু মনে মনে এক আবেগহীন উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করে এইসব সংবাদ।

প্লেগের নানা রকম পরিসংখ্যান রাখার কাজ এখনও করে যাচ্ছে গ্রাঁদ। কিন্তু যে কেউ ওকে দেখলে বুঝতে পারে শরীর আর স্বাস্থ্য আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে ওর। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছে ও। রিও-র কাছে জেনিকে নিয়ে নানারকম গল্প করে। 'জানি না কোথায় আছে ও? খবরের কাগজের পাতা ওল্টাবার সময় আমার কথা কি মনে পড়ে?'

রিও একদিন অবাক হয়ে লক্ষ করল, সে নিজেও গ্রাঁদ-এর কাছে ওর স্ত্রী সম্পর্কে গল্প করছে। স্ত্রীর কাছ থেকে যেসব টেলিগ্রাম আসে, সেগুলোকে আদৌও বিশ্বাস করতে পারে না ও। তাই ঠিক করল টেলিগ্রাম পাঠিয়ে স্বাস্থ্যনিবাসে ডাক্তারের কাছ থেকে সত্যিকারের খবরটা নেবে। উত্তরে ওকে জানানো হলো, ওর স্ত্রীর শরীর ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা খারাপের দিকে গেছে, তবে তারা সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে। রিও গ্রাঁদকে বলল ও কাছে থাকলে স্ত্রীকে হয়তো অনেক সাহায্য করতে পারত। কথাগুলো বলেই হঠাৎ গুম মেরে গেল রিও। এরপর গ্রাঁদ অনেক প্রশ্ন করল ওকে, কিন্তু রিও সেগুলোকে এড়িয়ে গেল।

অন্যদের তুলনায় একমাত্র জাঁ তারিউই যা কিছুটা ধাতস্থ ছিল তখনও। ওর এ-সময়কার ডাইরি পড়লে বোঝা যায় এখনও অনেক ব্যাপারে কৌতূহল আছে ওর, কিন্তু আগের মত সব ব্যাপারেই

উৎসাহ আর নেই।

সবচেয়ে ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত মনে হয় ডাক্তার ক্যাসেলকে। একদিন রিও-র কাছে এসে ডাক্তার জানাল, সিরাম তৈরি করে ফেলেছে সে। ঠিক হলো, মসিয়ে অথন-এর ছোট ছেলেটার ওপর এই সিরাম প্রথম পরীক্ষা করা হবে। কেননা, ছেলেটার তখন জীবনের কোন আশাই আর নেই।

একদিন মৃত্যুর দৈনিক পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রিও তাকিয়ে দেখে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে ক্যাসেল। ওর এই অবস্থা দেখে ভীষণ দুঃখ পেল রিও। ক্যাসেল-এর চেহারায় আগে সবসময় ফুটে থাকত একটা তারুণ্যের আভাস। আর এখন ওর ঘুমন্ত মুখে দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা।

সারা শহরে তখন একটাই মানুষ আছে, যার ভেতর ক্লান্তি কিংবা হতাশা নেই। সে মানুষটি—কটার্ড। রিও এবং র‍্যাঁবেয়াকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে ও। কিন্তু কিছুটা জোর করেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তারিউ-এর সঙ্গে। সুযোগ পেলেই ওর সঙ্গে দেখা করে কটার্ড। তারিউ ওর ব্যাপারটা পুরোপুরি জানে, আর ও বেড়াতে এলে খাতির যত্ন করে। কটার্ডও ওর কাছে গেলে বেশ স্বস্তিবোধ করে। 'কটার্ড এবং প্লেগের সঙ্গে ওর সম্পর্ক', এই শিরোনামে তারিউ ওর ডাইরিতে কিছু মন্তব্য লিখে রেখেছে।

'দেখে মনে হয় স্বাস্থ্য এবং লাবণ্যে ফেটে পড়ছে লোকটা। আচরণের ভেতর বেড়েছে অমায়িক ভাব। সেই সঙ্গে বেড়েছে হাসিঠাট্টা। চারপাশের ঘটনায় এতটুকু বিচলিত হয় না মানুষটা।

'মাঝে মাঝে আমাকে বলে, "অবস্থা দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাই না? তবে ব্যাপার কী জানেন, আমরা এখন সবাই এক

নৌকার যাত্রী।"

'একটা অদ্ভুত ধারণা মাথায় ঢুকেছে ওর। আমাকে বলে, "যে লোক আগে থেকেই কোন কঠিন অসুখে ভুগছে কিংবা খুব মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে, তাকে খুব সহজে কোন রোগ কিংবা নতুন দুশ্চিন্তা আক্রমণ করে না।"

' "আপনি কখনও একই সঙ্গে কোন লোককে দুটো কঠিন অসুখে ভুগতে দেখেছেন? এমন কখনও হয় না। আপনার ক্যান্সার কিংবা রক্তবমি হলে প্লেগ বা টাইফয়েড আপনাকে ছোঁবে না। কোন ক্যান্সার রোগীকে মোটর চাপা পড়ে মরতে দেখেছেন?"

'অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে কাউকে একা একা থাকতে বাধ্য করাটাকে কটার্ড ঘৃণা করে। অবরুদ্ধ শহরে অনেক মানুষের সঙ্গে বাস করতে ও প্রস্তুত, কিন্তু জেলের ভেতর নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে মোটেও রাজি নয়।

'প্লেগ যেদিন থেকে শুরু হলো সেদিন থেকে ওর পিছনে ঘোরা বন্ধ করেছে পুলিস। সত্যি কথা বলতে কি, শহরে এখন পুলিস বলতে আলাদা কোন কিছু নেই। অতীত বা বর্তমান অপরাধ বলেও কিছু নেই। এখানে শুধু একদল অভিশপ্ত মানুষ ভবিষ্যতে কবে মুক্তি পাবে, এ-রকম একটা অনিশ্চিত আশায় বর্তমানের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে, পুলিসও আছে ওই দলে।

'একদিন ও আমাকে বলল, "মসিয়ে তারিউ, আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। যদি সত্যি সত্যি চান মানুষ একসঙ্গে বাস করুক, তাহলে তার একটাই মাত্র উপায় আছে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন মাঝে মাঝে প্লেগের আবির্ভাব হয়।"'

এক সন্ধ্যায় কটার্ড এবং তারিউ গেল অপেরা-হাউসে। তখন দেখানো হচ্ছে গ্লাক-এর 'অরফিয়স'। কটার্ডই তারিউকে সঙ্গে করে

নিয়ে গেছে। সবচেয়ে দামী সীট দুটোতে বসেছে ওরা। একসারি থেকে অন্য সারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সান্ধ্য পোশাক পরা দর্শকের দল। পরিচিত কেউ বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হতেই ওরা অত্যন্ত শোভনভাবে পরস্পরকে সালাম জানাচ্ছে। চারপাশ থেকে আলো এসে ছিটকে পড়ছে ওদের ওপর। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সবার মনে ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাস। অথচ একটু আগেও, ওরা যখন শহরের রাস্তায় হাঁটছিল তখন সবাইকে মনে হচ্ছিল হতাশাগ্রস্ত।

নাটক শেষ হতে উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। হল ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে এগিয়ে চলল সবাই। প্রথমে ধীরে ধীরে নীরবে এগুলো, যেন প্রার্থনা শেষে গির্জা ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে, কিংবা মৃতব্যক্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছে তার ঘর থেকে। তারপর দ্রুত হলো চলা। ফিসফিসানি রূপান্তরিত হলো হৈ-চৈ-এ। এরপর শুরু হলো হুড়োহুড়ি। ধাক্কাধাক্কি করে ওরা যখন বাইরে এসে রাস্তায় নামল, তখন সবারই দিশেহারা অবস্থা। আশঙ্কায়, উত্তেজনায় তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল প্রত্যেকেই।

উঠল কটার্ড এবং তারিউও। কিন্তু মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই হতবাক হয়ে গেল ওরা, দেখল জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় দৃশ্য। দেখল, মূকাভিনেতার বেশে প্লেগ দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চে; আর লাল কাপড়ে ঢাকা দর্শকদের চেয়ারের ওপর পড়ে আছে সৌখিন খেলনা, হাতপাখা, আর ঝালর লাগানো দামী দামী শাল।

দুই

রিও-র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এতদিন টানা কাজ করে গেছে র‍্যাঁবেয়া। সেপ্টেম্বরের শুরুতে একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিল ও। সেদিন দুপুরে গনজালেস এবং সেই দুই যুবকের সঙ্গে হাইস্কুলের মাঠে দেখা করার কথা ওর। ঠিক সময়ে এসে হাজির হলো গনজালেস। ওরা গল্প করতে করতে দেখল যুবক দুজনও হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ওরা বলল, 'গেল সপ্তাহে কোন সুবিধে করতে পারিনি। এ-সপ্তাহে আমাদের ডিউটি নেই। আপনাকে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

র‍্যাঁবেয়া স্বীকার করল, আসলেই এ-ধরনের কাজে ধৈর্যের দরকার।

গনজালেস প্রস্তাব দিল, 'সামনের সোমবারে আমাদের সবার দেখা হওয়া উচিত।' এরপর র‍্যাঁবেয়াকে বলল, 'আপনার এখন লুই-মার্সেল-এর বাসায় গিয়ে থাকাটাই ভাল। ঠিক আছে, আমরা দুজনে না হয় একটা দিন ঠিক করে নেব। কোন কারণে আমি যদি আসতে না পারি, আপনি সোজা ওদের বাসায় চলে যাবেন। ঠিকানাটা আমি দিয়ে দেব আপনাকে।'

যুবকদের একজন গনজালেসকে বলল, 'আপনি এক্ষুণি আপনার

বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাসায় এলে সবচেয়ে ভাল হয়। তাহলে খুব সহজেই আমাদের বাসাটা খুঁজে বের করতে পারবেন। আপনাদের আপত্তি না থাকলে, দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের ওখানেই হবে।'

গনজালেস রাজি হলো ওদের প্রস্তাবে। চারজনই হাঁটতে লাগল বন্দরের দিকে।

ডকইয়ার্ডের একেবারে শেষে মার্সেল আর লই-এর বাসা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে যে রাস্তাটা তার সামনেই একটা ফটক। আর এর সামান্য দূরে বাসাটা। ছোট। স্পেনে যেমন ছোট ছোট বাড়ি দেখা যায় তেমনি। জানালার শার্সিগুলোয় উজ্জ্বল রঙের পলিশ। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, আসবাবপত্র নেই। লুই আর মার্সেল-এর মা, হাসিখুশি চেহারার এক বৃদ্ধা স্প্যানিশ মহিলা, খাবার এনে রাখল ওদের সামনে। তাঁর মুখের চারপাশে বয়সের ভাঁজ। খাবারের বেশির ভাগই ভাত। ভাত দেখে বিস্মিত হলো গনজালেস, কেননা কিছুদিন থেকে শহরে চাল পাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

র‍্যাবেয়া তখন ভাবছে সামনের সপ্তাহটার কথা। পরে, ওরা বলল ওকে দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

সেই দুই সপ্তাহ চোখকান বন্ধ করে উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেল র‍্যাবেয়া। বিছানায় গেল অনেক রাতে। কোন কোন রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ল। এক রাতে, বার থেকে বেরিয়ে র‍্যাবেয়ার মনে হলো ওর পুরষাঙ্গটা কেমন যেন ফোলা ফোলা লাগছে। হাত নাড়ার সময় বগলে অনুভব করল ব্যথা। 'এবার তাহলে আমার পালা,' ভাবল ও। মন বলল, এক্ষুণি পালাতে হবে। 'ছুটে শহরের বাইরে যাব। সেখানে দাঁড়াব একটা পার্কে। সেখান থেকে সমুদ্র চোখে না পড়ুক, আকাশটাকে তো অনেক বড় করে

দেখা যাবে। তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করব প্রেমিকার নাম ধরে। যেন আমার গলার স্বর শহরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পৌঁছায়,' র‍্যাঁবেয়ার তখন এরকমই ইচ্ছে হলো। কিন্তু বাসায় ফিরে দেখল প্লেগের কোন লক্ষণই নেই ওর শরীরে। 'সত্যিই মাতাল হয়ে গেছিলাম,' রিও-র কাছে পরে স্বীকার করল ও।

এক রাতে রিও-র কাছে বিদায় নিতে গেল র‍্যাঁবেয়া। রিও বলল, 'আজ সকালে মসিয়ে অথন আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বললেন, আমি আপনাকে চিনি কিনা? আমি বললাম, চিনি। তিনি তখন বললেন, আমি যদি সত্যিই আপনার বন্ধু হয়ে থাকি তাহলে যেন আপনাকে সাবধান করে দিই, চোরাচালানকারীদের সাথে অত মেলামেশা না করতে।'

'কি বলতে চান উনি?'

'আমার মনে হয়, পালাবার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে আপনাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ,' রিও-র হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল র‍্যাঁবেয়া।

দরজায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ও। রিও দেখল, প্লেগ দেখা দেয়ার পর থেকে আজ এই প্রথম প্রাণ খুলে হাসছে র‍্যাঁবেয়া।

'কিন্তু আপনি আমার যাওয়াটা বন্ধ করছেন না কেন, বলুন তো? সেটা তো সহজেই করতে পারেন।'

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল রিও। তারপর হেসে বলল, 'আমি নিজেও হয়তো ব্যক্তিগত সুখের কথাটাই চিন্তা করতে শুরু করেছি।'

রবিবারে র‍্যাঁবেয়া উঠল মার্সেল এবং লুইদের ছোট্ট বাসায় গিয়ে। ওকে থাকতে দেয়া হলো বসার ঘরে। দুই পাহারাদার সাবধান করে দিল, ও যেন বাইরে বেশি ঘোরাফেরা না করে। দুপুর বেলা ওরা কেউ খেতে এল না। বেশির ভাগ সময় ওকে কাটাতে

হলো একাকী। মাঝেমাঝে দেখা হলো ওদের মা-র সঙ্গে। ভদ্রমহিলা কথা একটু কম বলেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ফিরে যাবার পর তোমার প্রেমিকার শরীরে প্লেগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে, এটা ভেবে তোমার ভয় হয় না?'

'ওরকম বিপদের সম্ভাবনা খুব কম। আর, অন্যদিকে আমি যদি এখানে থেকে যাই, ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে আর দেখা হওয়ার কোন আশাই থাকবে না।'

বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'তোমার প্রেমিকা তোমাকে ভালবাসে?'

'খুব।'

'সুন্দরী?'

'আমার চোখে।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা। 'সেইজন্যেই তুমি ফিরে যেতে চাইছ।'

প্রতিদিন সকালে গির্জায় যাওয়া বৃদ্ধার অভ্যাস। একদিন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'না।'

'বুঝলাম,' মন্তব্য করলেন তিনি, 'তোমার ফিরে যাওয়াই উচিত। জীবনে তোমার পাবার মত কিছু তো আর নেই।'

সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরল মার্সেল আর লুই। র‍্যাঁবেয়াকে উৎসাহিত করবার মত কিছু বলতে পারল না ওরা। কেবল এটুকু বলল, পালাবার উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি। রাতে, খাবার পর, কিছুক্ষণ গিটার বাজাল মার্সেল। এরপর ওরা তিনজনে মদ খেতে লাগল একসঙ্গে। পুরো সময়টাই আপন চিন্তায় ডুবে রইল র‍্যাঁবেয়া।

বুধবারে, বাসায় ফিরে মার্সেল বলল, 'কাল রাতে আপনাকে তৈরি থাকতে হবে। বেরুতে হবে মাঝরাতে। একটু এদিক-ওদিক করলে চলবে না। আমাদের সঙ্গে যে দুজন পাহারা দেয়, তাদের

একজনকে প্লেগ ধরেছে। অন্যজনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ফটক পাহারার সম্পূর্ণ ভার এখন আমাদের ওপর। কী কী করতে হবে সেগুলো কাল রাতেই জানাব।'

'নিশ্চয় খুশি হয়েছ,' র‍্যাবেয়াকে বললেন বৃদ্ধা।

পরের দিন সকাল থেকেই অসহ্য গরম পড়তে শুরু করল। আবহাওয়া কেমন ভ্যাপসা। একটা ঘোমটার আড়ালে সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রইল সূর্য। মৃত্যুর হারও সেদিন বেড়ে গেল অসম্ভব রকম।

মার্সেল আর লুই-এর দেখাদেখি র‍্যাবেয়াও তার জামাকাপড় খুলে ফেলল। তবু ওর বুক আর কাঁধের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঘাম। পালিশ করা মেহগনি কাঠের মত চকচকে হয়ে উঠল ওদের সবার শরীর। খাঁচায় বন্দী হিংস্র প্রাণীর মত সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াল র‍্যাবেয়া।

বিকেল চারটায় ও বলল, 'আমি একটু বাইরে যাব।'

'মনে রাখবেন,' বলল মার্সেল, 'ঠিক রাত বারোটার সময় আপনাকে হাজির থাকতে হবে।'

র‍্যাবেয়া সোজা গেল রিও-র ফ্ল্যাটে। ওর মা বলল, শহরতলির হাসপাতালে ওকে পাওয়া যাবে।

হাসপাতালের ফটকের সামনে বেশ কিছু মানুষ ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছিল না ভেতরে। তবু সবাই দাঁড়িয়ে আছে রোদ এবং গরমের মধ্যে। পুলিস সার্জেন্টকে র‍্যাবেয়া ওর প্রবেশপত্র দেখাল। সে ওকে তারিউ-এর অফিসে যেতে বলল।

'এখনও যাননি?' ওকে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল তারিউ।

'না। রিও-র সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'ও এখন ওয়ার্ডে। কিন্তু দেখা না করলেই কী নয়; অন্য কাউকে

দিয়ে আপনার কাজ হবে না?'

'কেন বলুন তো?'

'ও ভীষণ ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম দিতে চাই।'

তরিউ-এর দিকে তাকিয়ে রইল র‍্যাঁবেয়া। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। চোখে, শরীরে সবখানে ক্লান্তির ছাপ। ঝুলে পড়েছে চওড়া কাঁধ। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওয়ার্ডবয়। টেবিলের ওপর কয়েকটা ছোট কার্ড রেখে বলল, 'ছ'টি।' বলেই বেরিয়ে গেল।

কার্ডগুলো টেবিলে বিছিয়ে তারিউ বলল, 'সুন্দর কার্ড, তাই না? অথচ এগুলোই হচ্ছে মৃত্যু। গতরাতে ক'জন মারা গেছে তার হিসেব আছে এখানে।'

কার্ড এবং টেবিলের ওপর ছাড়ানো অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল তারিউ। 'খুব তাড়াতাড়িই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, না?'

'হ্যাঁ। আজ রাত বারোটায়।'

'খুব ভাল লাগছে। শুধু নিজের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।'

'সত্যি বলছেন?'

'আমার যা বয়েস তাতে মিথ্যা বলার অনেক ঝামেলা।'

'তারিউ, মাফ চাইছি। কিন্তু রিও-র সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।'

'জানি, রি-ওর মানবতাবোধ আমার চেয়ে অনেক বেশি। আচ্ছা, চলুন।'

'আমি কিন্তু সেরকম...,' কথা শেষ করতে পারল না র‍্যাঁবেয়া।

তারিউ ওর দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে।

একটা সরু বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। দু'পাশে হালকা

সবুজ রঙের দেয়াল। একবারে শেষে, কাচের দরজা। ওপারে, ঘরের ভেতর নড়াচড়া করছে লোকজন। ওখানে যাবার আগে পাশের একটা ছোট কামরায় র‍্যাঁবেয়াকে নিয়ে ঢুকল তারিউ। আলমারি খুলে জীবাণুনাশক ঔষধ ভর্তি একটা পাত্র থেকে কাপড়ে জড়ানো দুটো তুলোর মুখোশ বের করল ও। একটা পরতে দিল র‍্যাঁবেয়াকে।

এরপর কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। বিরাট ঘর। সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। মাথার ওপর ঘুরছে পাখা। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বদ্ধ বাতাস। দু'পাশে বিছানার সারি। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার। কোনটা তীক্ষ্ণ, কোনটা চাপা; মনে হচ্ছে একঘেয়ে সুরে স্তোত্র পাঠ চলছে। নীরবে এক বিছানা থেকে আর এক বিছানায় রোগী দেখে বেড়াচ্ছে সাদা অ্যাপ্রন পরা লোকজন।

সামনে একটা বিছানায় ঝুঁকে আছে রিও। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে একটি মানুষ। ওর দুই পা টেনে ফাঁক করে ধরে রেখেছে দুজন নার্স। রোগীর কুচকি ছুরি দিয়ে চিরে দিচ্ছে রিও। মাথা তুলল ও। একজন সাহায্যকারী একটা ট্রে এগিয়ে ধরতেই হাতের যন্ত্রপাতিগুলো রাখল ওটায়। ব্যান্ডেজ করে দেয়া হলো রোগীকে।

'কোন খবর?' তারিউকে জিজ্ঞেস করল রিও।

'ফাদার প্যানালু কোয়ারেনটাইন স্টেশনে র‍্যাঁবেয়ার জায়গায় কাজ করতে রাজি হয়েছেন। ডাক্তার ক্যাসেল বেশকিছু টিকা তৈরি করেছেন, টিকাগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

'সুসংবাদ।'

'আর র‍্যাঁবেয়া এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

ঘুরে দাঁড়াল রিও। 'আপনি এখানে কেন? আপনার তো অন্য কোথাও থাকার কথা।'

'আজ মাঝ রাতেই ও চলে যাচ্ছে,' বলল তারিউ।

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে,' বলল র‍্যাঁবেয়া।

'আচ্ছা। এক্ষুণি আসছি। আপনি তারিউ-এর অফিসে অপেক্ষা করুন।'

কয়েক মিনিট পর। গাড়ির পিছনের সীটে বসে আছে রিও, এবং র‍্যাঁবেয়া। স্টিয়ারিংয়ে তারিউ।

'ডাক্তার, আমার হয়তো আর যাওয়া হলো না। আপনাদের সঙ্গেই থেকে গেলাম,' বলল র‍্যাঁবেয়া।

কোন নড়াচড়া করল না তারিউ। অখণ্ড মনোযোগে গাড়ি চালাতে লাগল।

'কিন্তু আপনার প্রেমিকা, তার কী হবে?' অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল রিও।

'এই মুহূর্তে পালিয়ে গেলে ব্যাপারটা আমার জন্যে খুব লজ্জার হবে। আমাদের সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'এ-রকম চিন্তা করা ঠিক নয়। কেউ যদি নিজের সুখকেই জীবনের প্রধান জিনিস বলে মনে করে তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

'তা ঠিক। কিন্তু শুধু নিজেকে নিয়েই সুখী হওয়া, কেবল নিজের সুখের কথাটাই চিন্তা করা সেটা নিশ্চয় লজ্জার।'

এবার কথা বলল তারিউ। 'র‍্যাঁবেয়া যদি সত্যিই অন্যের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে এসে দাঁড়ায়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে নিজের সুখভোগের আর কোন অবকাশ নেই ওর।'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এতদিন আমি নিজেকে এই শহরে একজন বহিরাগত মনে করতাম। কিন্তু এই ক'দিনে উপলব্ধি করেছি আমি চাই বা না চাই, আমি এখানকারই একজন।'

কেউ কোন কথা বলল না। সেদিন মাঝরাতে র‍্যাঁবেয়ার হাতে

একটা ম্যাপ দিল রিও। পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারিউ। শহরে যে অঞ্চলের ভার দেয়া হয়েছে র‍্যাঁবেয়াকে, ম্যাপটা সেখানকার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারিউ প্রশ্ন করল, 'আপনার সিদ্ধান্তের কথা ওদের জানিয়েছেন?'

'একটা চিরকুট পাঠিয়েছি।' মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল র‍্যাঁবেয়া।

তিন

ডাক্তার ক্যাসেল-এর তৈরি প্লেগের টিকা অক্টোবরের শেষে প্রথম ব্যবহার করা হলো। এটাই এখন রিও-র শেষ অস্ত্র। ও জানে, এতে কাজ না হলে মহামারীর করুণার ওপর ছেড়ে দিতে হবে গোটা শহরটাকে।

যেদিন ক্যাসেল রিও-র সঙ্গে দেখা করল ঠিক তার আগের দিন মসিয়ে অথন-এর ছোট ছেলেটা প্লেগের খপ্পরে পড়ল। রিও ঘরে ঢুকে দেখল বাবা-মা দুজনেই ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটার তখন চরম অবস্থা। কোন দিকে তাকানোর বা অনুভব করার মত কোন শক্তি তখন ওর নেই। নিজের ইচ্ছেমত ওর শরীর পরীক্ষা করল রিও। কোন বাধা দিল না ছেলেটা। মাথা তুলে রিও দেখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন মসিয়ে অথন। তাঁর পিছনে মাদাম অথন, চেহারা রক্তশূন্য, মুখ চেপে ধরেছেন একটা রুমাল দিয়ে।

'মনে হচ্ছে প্লেগে ধরেছে,' আস্তে কথাগুলো বললেন মসিয়ে অথন। এত আস্তে যে শোনাই যায় না প্রায়।

'হ্যাঁ। তাই মনে হচ্ছে,' বলে ছেলেটার দিকে আবার তাকাল রিও। বিস্ফারিত হলো মাদাম অথন-এর চোখ দুটো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

'ডাক্তার, আইন অনুযায়ী যা করার তা তো করতেই হবে,' আগের চেয়েও ক্ষীণ স্বরে বললেন মসিয়ে অথন।

মাদামের দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টা করল রিও। 'হ্যাঁ। যা করার এক্ষুণি করছি। আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে চাই।' যাবার আগে রিও মাদামকে বলল, 'দুঃখিত। আপনাকেও যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে।'

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেন মাদাম অথন। মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

বিদায় নেয়ার আগে ভাবাবেগের বশে ওদের কাছে জানতে চাইল রিও, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন সাহায্যের দরকার আছে আপনাদের?'

'না,' ঢোক গিললেন ম্যাজিস্ট্রেট অথন। 'তবে আমার ছেলেটাকে একটু দেখবেন।'

মাদাম অথনকে পাঠানো হলো র‍্যাবেয়া যে কোয়ারাইনটা দেখাশোনা করে সেটায়। মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস গ্রাউন্ডের ক্যাম্পে পাঠানো হলো মসিয়ে অথনকে। ছেলেটাকে রাখা হলো অস্থায়ী হাসপাতালের ওয়ার্ডে। বিশ ঘণ্টা পর রিও পরিষ্কার বুঝতে পারল ওকে আর বাঁচানো যাবে না। সংক্রমণ খুব দ্রুত ওর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, অথচ ছেলেটার কোন প্রতিরোধ শক্তি নেই। সম্পূর্ণ ফুটে বেরুতে পারেনি, অথচ কঠিন যন্ত্রণাদায়ক, ছোট ছোট গুটিগুলো

ওর অপুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বন্ধ করে ফেলছে।

রাতে খাওয়ার পর, ও আর ক্যাসেল ছেলেটার শরীরে টিকা দেয়া আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। সকালে আবার ওরা এল ছেলেটার পাশে।

আশ্চর্য। ওর হাত-পা নড়ছে। বিছানার ওপর এপাশ-ওপাশ করছে ছেলেটা। এসময় ওখানে ছিল ওরা তিনজন–রিও, ক্যাসেল, আর তারিউ। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে দিনের আলো ফুটতে লাগল। একে একে অন্যারাও এল ওখানে। প্রথমে এলেন ফাদার প্যানালু। গ্রাঁদ এল বেলা সাতটায়।

ছেলেটার চোখ তখন সম্পূর্ণ বন্ধ। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। যন্ত্রণায় মুখ এমন ভাবে খিঁচাচ্ছে যে মনে হচ্ছে ভেংচি কাটছে। বালিশের ওপর মাথাটাকে বারে বারে এপাশে ওপাশে নাড়াচ্ছে ছেলেটা।

র‍্যাবেয়া যখন ঘরে ঢুকল তখন অন্ধকার কেটে গেছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার পকেটে ওটা ঢুকিয়ে রাখল ও।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণাকাতর ছেলেটাকে দেখছিল রিও। হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল রোগীর কচি শরীর। বেঁকে গেল কোমর। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল ইংরেজি 'এক্স'-এর মত। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় কম্বলের নিচে শুয়ে আছে ছেলেটা। শরীর থেকে ভেসে আসছে ঘাম আর উলের গন্ধ। দাঁতে দাঁত বসে গেল ওর। এরপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল শরীর। হাত-পা গুটিয়ে নিল। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। চোখ বন্ধ। হঠাৎ জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল ও।

তারিউ-এর দিকে তাকাল রিও। চোখ নামিয়ে নিল তারিউ। গত কমাসে অসংখ্য শিশুকে মরতে দেখেছে ওরা; মৃত্যু কাউকেই

এতটুকু দয়া দেখায়নি, কিন্তু এভাবে পলে পলে কোন ছেলের মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ করেনি।

ঠিক সেই সময় কুঁকড়ে উঠল ছেলেটার শরীর। মনে হলো পেটে কিছু কামড়াচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ও। অনেকক্ষণ ধরে কুঁকড়ে পড়ে রইল। এরপর খিঁচুনিতে থরথর করে কাঁপতে লাগল সমস্ত শরীর।

তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল জ্বরের দমকা বেগ। ধীরে ধীরে উত্তাপও নেমে গেল শরীর থেকে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেল ও। অতি কষ্টে শ্বাস নিতে লাগল।

যখন তৃতীয়বারের মত এল উত্তাপের ঝাপটা, বিছনা থেকে শরীরটাকে উঁচুতে তুলে, হাত-পা গুটিয়ে ফেলল ছেলেটা, বিছানার ধারে গড়িয়ে পড়ল দেহ, মাথাটা বালিশের ওপর কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করার পর শরীর থেকে ফেলে দিল কম্বল, চোখের উত্তপ্ত মণি দুটো ফেটে গড়িয়ে পড়ল পানি। ঘাম আর অশ্রুভেজা ছোট্ট মুখটার দুপাশে হাত বুলাতে লাগল তারিউ। ওয়ার্ডের বাকি নজন রোগীও তখন বালিশের ওপর মাথা নাড়ছে আর নিচু স্বরে গোঙাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গ্রাঁদ। ছেলেটার চোখ দু'টি তখনও বন্ধ। কিন্তু শরীর আগের চেয়ে অনেক শান্ত। ছোট ছোট আঙুল দিয়ে খাটের কিনার ধরার চেষ্টা করল ও। এরপর হাঁটু চুলকাল। তারপর হঠাৎ করে পা গুটিয়ে উরু দুটো রাখল পেটের ওপর। সেই ভাবেই স্থির হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, এবং এই প্রথম চোখ খুলল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল রিওঁ। ছেলেটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। ছোট্ট মুখটা ভাবলেশহীন, যেন মাটির ধূসর মুখোশ পরে আছে। ধীরে ধীরে ওর ঠোঁট একটু ফাঁক হলো, তারপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল টানা চিৎকার। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল

রিও-র। তারিউ বাইরে তাকাল চোখ ফিরিয়ে। র‍্যাবেয়া এগিয়ে এসে দাঁড়াল ক্যাসেল-এর পাশে। ফাদার প্যানালু ছেলেটার কচি মুখখানার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলেন। মুখের চারপাশে ময়লা জমেছে। হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি, 'ঈশ্বর। এই ছোট শিশুটিকে তুমি রক্ষা করো...'

ছেলেটা তেমনি চিৎকার করে চলল। ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরাও অধৈর্য হয়ে উঠল এবার। তারাও শুরু করল আর্তনাদ। সমস্ত ওয়ার্ডে ঝড় বইতে লাগল আর্তনাদের।

ওই আর্তনাদে ঢাকা পড়ে গেল ফাদার প্যানালু-র প্রার্থনা। তখনও খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রিও। অবসাদে, বিরক্তিতে ওর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এক সময় চোখ খুলে দেখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারিউ। 'আর নয়, বাইরে যেতে চাই। এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না,' বলল রিও।

ঠিক এ-সময়ে ওয়ার্ডে থেমে গেল আর্তনাদ। রিও দেখল, ছেলেটার কাতরানিও ক্ষীণ হতে হতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাসেল। বলল, সব শেষ। তখনও ছেলেটার মুখ খোলা আছে। ফাদার প্যানালুও পাশে এলেন; তারপর চলে গেলেন।

তারিউ ক্যাসেলকে বলল, 'আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে আপনাকে, তাই না?'

ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটল ক্যাসেল-এর। মাথাটা ঝাঁকাল কিছুক্ষণ। 'হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। তবে টিকা নেয়ার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে রোগের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি পেয়েছিল ছেলেটা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রিও। দরজায় ফাদার প্যানালু-র সামনে পড়ে গেল। ওর চাহনি আর চলার গতি লক্ষ করে হাত

বাড়িয়ে ওকে থামাতে গেলেন ফাদার। 'আসুন, ডাক্তার সাহেব...' ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে পাদ্রির দিকে ঘুরে দাঁড়াল রিও। 'বলুন। কী বলার আছে আপনার? এই বাচ্চা ছেলেটা নিশ্চয় কোন পাপ করেনি। বলতে পারেন কী অপরাধ ছিল ওর?'

ফাদারকে ঠেলে সরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত বেরিয়ে গেল রিও। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল ছেলেদের খেলার মাঠের অপর পাশে। ছোট ছোট ডুমুর গাছের তলায় অনেকগুলো কাঠের বেঞ্চ রয়েছে ওখানে। দরদর করে ঘাম ঝরছে ওর শরীর থেকে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে অবসাদে। বেঞ্চে বসে চোখ-মুখের ঘাম মুছল রিও।

ডুমুর গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে আগুনের ফোয়ারার মত নেমে আসছে রোদ। চারপাশ কেমন গুমোট একটা ভাব। অবসন্ন শরীরটাকে বেঞ্চে এলিয়ে দিল ও। পাতার ফাঁকে দেখল রোদে পোড়া দূরের আকাশ। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল ওর শ্বাস-প্রশ্বাস।

পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। 'হঠাৎ এত রাগ করলেন কেন? যে দৃশ্য আপনার কাছে অসহ্য, সেটা আমার কাছেও অসহ্য।'

ফাদার প্যানালু-র দিকে চোখ ফেরাল রিও। 'আমার তখনকার ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত। সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটা দুর্বার ইচ্ছা মাঝে মাঝে পেয়ে বসে আমাকে।'

'সেটা আমি বুঝি। কিন্তু যা বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে আমাদের ভালবাসার চেষ্টা করা উচিত।'

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল রিও। অবসাদ কাটিয়ে বলল, 'আপনার কথা মেনে নিতে পারলাম না। যেখানে নিষ্পাপ শিশুদের কষ্টের শিকার হতে হয় সেখানে ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না।'

'ঈশ্বরের করুণা যে কী জিনিস এই মুহূর্তে আমি তা উপলব্ধি

করেছি।'

'করুণা জিনিসটা যে কী তা জানার সৌভাগ্য আমার আজও হয়নি। তবে এগুলো নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল। আমরা এখন একটা কিছুর জন্যে পাশাপাশি কাজ করছি। এ-কাজ ঈশ্বরের নিন্দা বা প্রার্থনার অনেক ঊর্ধ্বে।'

'আপনিও মানুষের আত্মার কল্যাণের জন্যে, মুক্তির জন্যে কাজ করছেন।'

'না। মানুষের দেহকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায় আমার মাথাব্যথা সেটা নিয়েই।'

'আচ্ছা। তাহলে উঠি।' পানিতে ছলছল করে উঠল ফাদারের চোখ।

'দেখুন, আমার ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত। ক্ষমা করে দেবেন। এ-ধরনের ব্যবহার আর কখনও করব না।'

'তাতে কী। আপনার ভেতর বিশ্বাস তো জন্মাতে পারিনি এখনও।'

'তাতে কী আসে যায়?' ফাদারের হাত ধরে রিও বলল, 'আসলে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি মৃত্যু, ব্যাধি এগুলোকে। আমরা এর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছি। এ-কাজে কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না—স্বয়ং ঈশ্বরও নন।'

চার

রিও এবং ওর সহকর্মীদের সঙ্গে কাজে যোগ দেয়ার পর থেকে ফাদার প্যানালু-র বেশির ভাগ সময় কাটে হাসপাতালে হাসপাতালে, আর নয়তো এমন সব জায়গায়, যেখানে তাঁকে প্লেগের রোগীদের সংস্পর্শে আসতে হয়। এর ফলে ঘন ঘন মৃত্যুর দেখা পাচ্ছেন তিনি। আর তাই প্রায়ই তাঁর মনে হয় হয়তো যে-কোন মুহূর্তে তাঁকেও এই রোগের শিকার হতে হবে, এবং মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও শুরু করেছেন তিনি। অবশ্য তাঁর মানসিক প্রশান্তিতে যে ফাটল ধরেছে, এটা বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না। কিন্তু যেদিন চোখের সামনে মসিয়ে অথন-এর ছোট্ট ছেলেটাকে মারা যেতে দেখলেন, সেদিন থেকে তাঁর ভেতর একটি পরিবর্তনের জোয়ার আরম্ভ হলো। তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল দুর্ভাবনা আর উদ্বেগের চিহ্ন।

একদিন রিওকে ফাদার বললেন, 'ডাক্তারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া কি একজন ধর্মযাজকের উচিত? এই শিরোনামে আমি একটা ছোট নিবন্ধ লিখছি। খুব তাড়াতাড়ি একটা ধর্মীয়সভা ডেকে বক্তৃতা দেব। আশা করি আপনিও আসবেন।'

ফাদার প্যানালু-র দ্বিতীয় ধর্মীয়সভায় আগের চেয়ে অনেক কম মানুষ এল তাঁর বক্তৃতা শুনতে। আগের বারের তুলনায় তিনভাগের

একভাগ মানুষ এল সেদিন। কেননা ইতিমধ্যে ধর্মের প্রতি শহরবাসীদের আকর্ষণ অনেক কমে এসেছে; তারা সাধারণ ধর্মীয় আচার-আচরণের বদলে ঝুঁকে পড়েছে উদ্ভট কুসংস্কারের দিকে।

আগের বারের তুলনায় অনেক শান্ত গলায়, অনেক ভেবেচিন্তে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন ফাদার। কয়েকবার আটকে গেল কথা। এবার আর 'আপনারা' না বলে 'আমরা' বলে সম্বোধন করলেন তিনি।

বললেন, হয় স্রষ্টাকে ঘৃণা করতে হবে, আর নইলে তাকে ভালবাসতে হবে। কিন্তু ঘৃণা করার সাহস আমাদের কারও আছে কী? আরও বললেন, ডাক্তারের কাছ থেকে ধর্মযাজকদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

এই বক্তৃতার কয়েকদিন পরেই ফাদার প্যানালুকে গির্জায় তাঁর থাকার ঘরটা ছেড়ে দিতে হলো। প্লেগের জন্যে তখন অনেক বাসস্থানই জবরদখল করা হয়েছে। ফাদারকে থাকতে দেয়া হলো ধার্মিক এক বৃদ্ধামহিলার বাসায়।

এখানে আসার পর থেকেই দুর্বল বোধ করতে শুরু করলেন তিনি। দৈহিক এবং মানসিক, দুদিক থেকেই। এক সন্ধ্যায়, সেন্ট ওডালিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর গুণাগুণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ভদ্রমহিলা, সে-সময় ফাদার কিছুটা অধৈর্যের ভাব দেখালেন। এতে ভদ্রমহিলা তাঁর ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন।

এরপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের শোবার ঘরে যাওয়ার সময় ফাদার দেখতে পান ড্রয়িংরুমের চেয়ারে তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন ভদ্রমহিলা। এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মহিলা বললেন, 'আপনার জন্যে শুভরাত্রি কামনা করি, ফাদার।'

এক সন্ধ্যায় ফাদার তাঁর হাতের কবজি, বগল, এবং কপালে

প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলেন। পরের দিন সকালে ভদ্রমহিলা দেখলেন, ফাদার তাঁর ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কিছুটা ইতস্তত করে দরজায় টোকা দিলেন তিনি। ভেতরে ঢুকে দেখলেন, তখনও বিছানায় শুয়ে আছেন ফাদার। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, এবং ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাঁকে। ভদ্রমহিলা খুব বিনীতভাবে ফাদারকে বললেন, 'একজন ডাক্তারকে আসতে বলি।' কিন্তু তাঁর প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন তিনি। ফাদারের এই আচরণ ভদ্রমহিলার কাছে অভদ্রতা বলে মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে এলেন তিনি। বেলা একটু বাড়লে ফাদার বাসার পরিচারিকাকে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ডেকে আনলেন। তাঁর অশোভন আচরণের জন্যে ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি। বললেন, 'সত্যি, আমাকে প্লেগ ধরেনি। সে-রকম কোন লক্ষণই আমার শরীরে নেই।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'প্লেগের ভয়ে আমি ডাক্তার ডাকতে চাইনি। নিজেকে নিয়ে আমার কোন ভয় নেই। কিন্তু আপনি যতক্ষণ আমার বাসায় আছেন ততক্ষণ আপনার ভালমন্দ দেখা আমার কর্তব্য।' ফাদার এতে কোন সাড়া দিলেন না। ভদ্রমহিলা তখন তাঁর কাছে ডাক্তার ডেকে পাঠানোর অনুমতি চাইলেন। ফাদার প্রথমে তাকে বেশি উদ্বিগ্ন হতে বারণ করলেন, পরে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। ভদ্রমহিলা এ থেকে যতটুকু বুঝলেন তাতে তার মনে হলো ডাক্তার দেখানো ফাদার ধর্মীয় নীতি বিরোধী কাজ বলে মনে করেন। তিনি অনুমান করলেন জ্বরের কারণে ফাদারের মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। তিনি তাঁকে এক কাপ চা এনে দিলেন।

তারপর প্রতি দুঘণ্টা পর পর ফাদার প্যানালুকে দেখে আসতে লাগলেন মহিলা। সারাটা দিন একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন ফাদার। কখনও গায়ের ওপর থেকে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দেন,

কিছুক্ষণ পর আবার তুলে নেন; কপালে হাত বুলাতে থাকেন ঘন ঘন। কপাল ঘামে ভিজে গিয়েছে তাঁর। থেকে থেকে বিছানার ওপরে বসে খুব জোরে জোরে কেশে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন। মনে হয় ফুসফুসের ভেতর শক্ত কোন জিনিস তাঁর শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করছে। প্রতিবারই ব্যর্থ চেষ্টার পর আবার তিনি এলিয়ে পড়েন বালিশের ওপর। ফাদার বিরক্ত হতে পারেন, এই ভয়ে ডাক্তার ডাকলেন না ভদ্রমহিলা।

বিকেলের দিকে ফাদারের সঙ্গে আর একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু কতগুলো অসংলগ্ন শব্দ ছাড়া ফাদারের মুখ দিয়ে কিছুই বেরুল না। ডাক্তার আনার কথাটাও আর একবার তুললেন ভদ্রমহিলা। শুনে বিছানার ওপর উঠে বসলেন ফাদার এবং দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানালেন। সবকিছু ভেবে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন ভদ্রমহিলা। অবশ্য এখানেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করলেন না, ঠিক করলেন রাতেও ফাদারকে কয়েকবার দেখে যাবেন। রাত এগারোটার দিকে তিনি ফাদারকে এক কাপ সুপ দিলেন এবং এরপর থেকেই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন এবং সোফায় গা এলিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাঁর ঘুম ভাঙল সকালে। উঠেই প্রথমে ছুটে গেলেন তিনি ফাদারের ঘরে। তখনও বিছানায় শুয়ে আছেন ফাদার। আগের দিনের মত চেহারায় লালচে ভাবটা নেই। মরা মানুষের মত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখ-মুখের ফোলা ফোলা ভাবটা এখনও আছে। বিছানার পাশের জ্বলন্ত ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। ভদ্রমহিলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর দিকে মুখ ফেরালেন। ভদ্রমহিলার মনে হলো সারারাত ধরে কে যেন ফাদারকে একটা মুগুর দিয়ে পিটিয়েছে। এখন তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা।

ফাদার বললেন, 'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। এটাই সরকারি নির্দেশ।'

তাঁর উদাসীন কথা শুনে চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। ভয়ে ছুটলেন টেলিফোন করতে।

দুপুর বেলা এল রিও। ফাদারের সমস্ত শরীর পরীক্ষা করে ও দেখল ফুসফুসের কিছু অসুবিধা ছাড়া প্লেগের কোন লক্ষণ নেই। ব্যাপারটায় অবাক হয়ে গেল ও।

'রোগের কোন চিহ্ন আপনার শরীরে দেখতে পাচ্ছি না,' ফাদারকে আশ্বাস দিয়ে বলল রিও। 'তবে নিশ্চিত করে কিছু বলা অসম্ভব। তাই আপনাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতেই হবে।'

অদ্ভুতভাবে হাসলেন ফাদার। হয়তো ভদ্রতা দেখালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। টেলিফোন করার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রিও। ফিরে এসে বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে থাকব।'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি তো জানেন, ধর্মযাজকের জন্যে বন্ধু বলে কিছু নেই। তাদেরকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে হয় ঈশ্বরের কাছে।'

মাথার ওপর একটা ক্রুশ ঝুলছিল। ওটাকে নামিয়ে তাঁর হাতে দেবার জন্যে রিওকে অনুরোধ করলেন ফাদার। ক্রুশটা হাতে নিয়েই তিনি একদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর থেকে একটা কথাও আর বললেন না ফাদার। তাঁর চিকিৎসার জন্যে যা যা করা হলো সবকিছুই মেনে নিলেন। শুধু ক্রুশটাকে এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করলেন না। কিন্তু তাঁর রোগটা কী সেটা কেউই বুঝতে পারল না। শরীরের তাপ ক্রমাগত বেড়েই চলল। আর বাড়তে লাগল কাশি। সন্ধ্যার দিকে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা লালচে পদার্থ। পরের দিন সকালে

মারা গেলেন ফাদার প্যানালু। তখনও তাঁর চোখ দুটো ছিল আগের মত শান্ত, নির্বিকার। মৃত্যুর কারণ হিসেবে তাঁর কার্ডে লেখা হলো: 'সন্দেহজনক রোগ।'

ইতিমধ্যে আর একটা নতুন জিনিস চালু হলো শহরে। হঠাৎ করেই বেড়ে গেল বর্ষাতির ব্যবহার। রাস্তায় বেরুলে দেখা যায় রবারের তৈরি চকচকে পোশাক পরে হেঁটে বেড়াচ্ছে শহরবাসীরা। কিছু দিন থেকে খবরের কাগজে প্রচার করা হচ্ছিল দুশো বছর আগে দক্ষিণ ইউরোপে প্লেগ-মহামারীর সময় সেখানকার ডাক্তাররা সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে তৈলাক্ত পোশাক ব্যবহার করত। এ-কারণেই বর্ষাতির ব্যবহার হঠাৎ করে বেড়ে গেল। এ-সুযোগে দোকানদাররা পুরনো ফ্যাশনের বর্ষাতিও বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করল।

পাঁচ

এ-বছর 'অল সোলস ডে'তে কেউই কবরস্থানে মৃত আত্মীয়স্বজনের কবর দেখতে গেল না। অন্যান্য বছর এ-দিনটিতে দেখা যেত রাস্তায় ভাড়াটে ট্যাক্সিগুলো মৌ মৌ করছে চন্দ্রমল্লিকার হালকা সুবাসে; কবরে ফুল দেয়ার জন্যে সার বেঁধে আত্মীয়স্বজনের কবরের দিকে এগিয়ে চলেছে মহিলারা। দীর্ঘদিন ধরে যেসব আত্মীয়স্বজন নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় শুয়ে আছে কবরের

অন্ধকারে, এইদিনে তাদের জন্যে শোক করে ওরা। কিন্তু প্লেগের বছরে মানুষ তাদের মৃতব্যক্তিদের স্মরণ করতে চাইল না। কেননা, এমনিতেই তাদের কথা বড় বেশি ভাবছে ওরা। দুঃখ আর বেদনার অশ্রু নিয়ে ওদের কাছে আবার যাবার তাই আর কোন প্রশ্ন আসে না। ওরা আর বিস্মৃত কেউ নয়, যার কাছে, বছরে একবার এসে নিজের দোষ স্খলন করে মানুষ। বরং অবাঞ্ছিত স্মৃতি ওরা, যাদের ভুলে যেতে চায় লোকে। বাস্তবিক এ কারণেই 'মৃতের দিন'কে নীরবে অথচ ইচ্ছেকৃতভাবে উপেক্ষা করল সবাই। কেননা, কটার্ড-এর ভাষায় এখন প্রতিটি দিন 'মৃতের দিন'।

বেশ কিছুদিন সবাই যখন দেখল প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যা খুব একটা বাড়ছে না, মৃতের সংখ্যার যে গ্রাফিক চার্টটি রোজ তৈরি করা হয় অনেকদিন সেটা উর্ধ্বমুখী থাকার পর একটা মন্থরগতি এসেছে সেটায়, তখন আরও অনেকের মত ডাক্তার রিচার্ড-এর মনেও জাগল আশা।

একদিন সে মন্তব্য করল, 'আমার মনে হয় রোগের প্রকোপ আর বাড়বে না। আস্তে আস্তে এটা এখন কমতেই থাকবে। আর পুরো কৃতিত্ব ডাক্তার ক্যাসেল-এর বানানো সিরামের।'

ডাক্তার ক্যাসেল ওর সঙ্গে একমত হতে পারল না। বলল, 'ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, ঠিক এ-রকম সময়েই একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গেছে রোগের দাপট।'

কর্তৃপক্ষ অনেকদিন থেকেই নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন মানুষের মনোবল শক্ত রাখার। কিন্তু মৃতের সংখ্যা বাড়ার ফলে তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এবার এই সুযোগে তারা ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের একটা সভা ডাকার প্রস্তাব দিলেন যেখানে সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাবে। কিন্তু

সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই আবার বেড়ে গেল প্লেগের আক্রমণ, আর ওদিকে হঠাৎ করে মারা গেল রিচার্ড। আবার হতাশায় ডুবে গেলেন কর্তৃপক্ষ। প্রিফেক্ট-এর অফিস ছাড়া শহরের আর সব সরকারি অফিস এবং ঘরবাড়িতে খোলা হলো হাসপাতাল আর নয়তো ক্যাম্প।

আগেই কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছিল প্লেগের সঙ্গে নিউমোনিয়া। এবার তার সংক্রমণ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইসব রোগী যখন কাশে তখন তাদের কফের সঙ্গে উঠে আসে রক্ত। আর রোগীরা মারাও যায় খুব তাড়াতাড়ি। সাধারণ প্লেগের চেয়ে এটাকে অনেক বেশি ছোঁয়াচে বলে মনে হলো। তাই স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবাণুমুক্ত কাপড়ের মুখোশ পরতে আরম্ভ করল।

খাদ্য-সংকটও ওদিকে ভয়াবহ রূপ নিল। যেসব খাবার দোকানে পাওয়া যায় না মুনাফাখোরদের কাছ থেকে সেগুলো চড়া দামে কিনতে হয় এখন। এর ফলে গরিব মানুষেরা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। ওরা কাছের শহর আর গ্রামগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিল যেখানে অনেক সস্তায় পাওয়া যায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ওইসব জায়গায় যাওয়ার অনুমতি এখন কর্তৃপক্ষের দেয়া উচিত। একটা স্লোগানে ছেয়ে গেল শহরের সব দেয়াল। 'খাবার আর মুক্ত বাতাস চাই।' এর কিছুদিন পর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বেরুতে লাগল।

কর্তৃপক্ষ খবরের কাগজগুলোকে নির্দেশ দিলেন যেভাবেই হোক আশার কথা প্রচার করতে হবে। সাংবাদিকরা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করলেন। এসময়কার রোজকার কাগজেই লেখা হতে লাগল: 'শহরের অধিবাসীরা সাহস এবং ধৈর্যের চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।' কিন্তু যে শহরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যে শহরকে পুরোপুরি নির্ভর

করতে হচ্ছে নিজের ওপর, সেখানে সে-মুহূর্তে কোনকিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। সাংবাদিকরা যাই বলে চেঁচান না কেন, শহরের সত্যিকারের খবর জানতে তারিউ ঘুরতে লাগল ক্যাম্পে ক্যাম্পে।

স্টেডিয়ামে যে ক্যাম্পটা খোলা হয়েছিল র‍্যাঁবেয়াকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সেটা দেখতে গেল তারিউ। শহরের এক প্রান্তে স্টেডিয়াম। এক পাশে বিরাট এক রাস্তা, অপর পাশে মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত পোড়ো জমি। স্টেডিয়ামের চারপাশে উঁচু কংক্রিটের দেয়াল। চারটে ফটকে সবসময় পাহারা দিচ্ছে চারজন সান্ত্রী। কংক্রিটের উঁচু দেয়ালগুলো ক্যাম্পের বিচ্ছিন্ন মানুষকে বাইরে চলমান মানুষদের উৎসুক দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে। ভেতরে আটকা পড়া মানুষরা সারাদিন ধরে বাইরে যেসব মোটর গাড়ি চলাচল করে তার শব্দ শুনতে পায়, আর ওই শব্দের কম-বেশি হওয়া থেকে অনুমান করে নেয় শহরের লোকজন কখন কাজ থেকে ঘরে ফিরছে আর কখনোই বা তারা তাদের কর্মস্থলে যাচ্ছে। এ থেকে তারা অনুমান করে নেয় বাইরের জীবন ঠিক আগের মতই চলছে।

তারিউ এবং র‍্যাঁবেয়া গেল রোববারের বিকেলে। ওদের সঙ্গে ছিল গনজালেস। র‍্যাঁবেয়া তখনও পর্যন্ত ওর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছে। র‍্যাঁবেয়া ওকে প্রস্তাব দিয়েছিল ক্যাম্প দেখাশোনার কাজে সাহায্য করতে। গনজালেস শুধু রোববারে কাজ করতে রাজি নয়। সেদিন ওরা গনজালেসকে সঙ্গে নিল ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে।

স্টেডিয়ামে ঢুকে ওরা দেখল চারপাশ লোকে লোকারণ্য। মাঠে কয়েকশো ছোট ছোট লাল তাঁবু। ভেতরে কম্বল, বিছানা আর কাপড়চোপড়ের বান্ডিল। ক্যাম্পের নিয়ম হচ্ছে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে নিজের নিজের তাঁবুতে ঢুকতে হবে। তারিউ,

র‍্যাবেয়া আর গনজালেস যখন গেল তখন কেউ বসে আছে তাঁবুর সামনে, স্ট্যান্ডের ওপর; কেউবা পায়চারি করছে মাঠে। তবে সবার দৃষ্টিই উদাস, হতাশায় ভরা।

'সারাদিন ধরে ওরা করে কী?' র‍্যাবেয়াকে প্রশ্ন করল তারিউ।

'কী আর করবে? করার মত কিছুই তো নেই,' উত্তর দিল র‍্যাবেয়া। এরপর বলল, 'প্রথম যখন ওদেরকে এনে এখানে ঢোকানো হয় তখন ওরা এত হৈ-চৈ করত যে কোন কথা শোনা যেত না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে সবাই কেমন যেন নির্বাক হয়ে উঠছে।'

মনে মনে ওদের এই নীরবতার কারণ খোঁজার চেষ্টা করল তারিউ। কিছু দৃশ্য ভেসে উঠল ওর কল্পনায়। ওর এই সব চিন্তা-ভাবনাকে ডাইরিতে লিখেও রাখে ও। লেখে: 'বিভিন্ন তাঁবুর ভেতর ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে অসুস্থ মানুষগুলোকে। তাদের চারপাশে সারাক্ষণ ভনভন করছে মাছি। গা চুলকাচ্ছে সবাই। প্রথম দিকে ওরা একে অপরকে শোনাত নিজের শঙ্কা বা ক্রোধের কথা। তখন অনেক সহৃদয় শ্রোতা পাওয়া যেত। কিন্তু ক্যাম্পে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে কারও অভাব-অভিযোগ শোনার মত শ্রোতা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই ওরা হয়ে পড়ল নির্বাক। শুধু তাই নয়, সবার প্রতি অবিশ্বাস জন্মাল ওদের। এখন এখানে দাঁড়ালে মনে হয়, মাথার ওপর ধূসর আকাশ থেকে শিশির কণার মত অবিশ্বাস ঝরে পড়ছে লাল রঙের তাঁবুগুলোর ওপর। কিন্তু সবচেয়ে যা বেদনাদায়ক তা হচ্ছে ওদের কথা ওদের আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবরা ভুলে গেছে, এবং ওরা সেটা অনুভব করে।'

ওদেরকে দেখে ক্যাম্পের ম্যানেজার কাছে এসে বলল, 'মসিয়ে অথন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।' গনজালেসকে ওখানে

রেখে তারিউ এবং র‍্যাবেয়াকে ভদ্রলোক নিয়ে গেল বড় চত্বরটার কাছে। সেখানে তখন একাই বসে ছিলেন মসিয়ে অথন। ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। পোশাক আগের মতই ফিটফাট। শুধু চুল আঁচড়াননি, আর জুতোর ফিতা খোলা। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে, চোখ পর্যন্ত তুলতে চাইছিলেন না। বললেন, 'আপনাদের দেখে খুব খুশি হয়েছিল। ডাক্তার রিও আমার পরিবারের জন্যে অনেক করেছেন। তাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।'

এরপর সম্পূর্ণ নীরবে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। অনেক চেষ্টার পর মসিয়ে অথন অবশেষে বললেন, 'আশা করি জ্যাকুইসকে খুব কষ্ট পেতে হয়নি।' তারিউ এই প্রথম মসিয়ে অথনকে তাঁর ছেলের নাম ধরে ডাকতে শুনল। এতেই ও বুঝল, মসিয়ে অথনও অনেক বদলে গেছেন।

তখন পশ্চিম দিগন্তে ডুবছে সূর্য। ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার শেষ কিরণ। 'হ্যাঁ,' উত্তর দিল তারিউ, 'সত্যিই ও তেমন কষ্ট পায়নি।' ওরা চলে আসার পরও সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন মসিয়ে অথন।

গনজালেস-এর কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। ওদের পৌঁছে দেবার জন্যে বেরিয়ে এল ক্যাম্প ম্যানেজার। এ-সময় ওরা শুনতে পেল কাছের স্ট্যান্ডগুলো থেকে ভেসে আসছে কর্কশ শব্দ। আগে যেসব মাইক থেকে খেলার ফলাফল ঘোষণা করা হত, পরিচয় করিয়ে দেয়া হত নতুন খেলোয়াড়দের, সেই মাইক থেকে এখন রাতের আহারের জন্যে সবাইকে নিজের নিজের তাঁবুতে ফেরার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এক পা দু পা করে ফিরে চলল ওরা। সবাই যখন ঢুকে গেল তাঁবুতে, ছোট ছোট দুটো ইলেকট্রিক ট্রাক, মোট বইবার কাজে যেমন দেখা যায় রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, ছড়ানো-ছিটানো তাঁবুগুলোর মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে যাত্রা শুরু করল

নিজেদের। একেকটা তাঁবুর সামনে গিয়ে থামছে ওরা। আর বন্দী মানুষ বাইরে এসে থালাসহ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ওপর পানে। ট্রাকের ওপর রাখা বড় বড় দুটো কড়াই থেকে লম্বা হাতায় করে খাবার তুলে পরিবেশন করা হচ্ছে অপেক্ষমাণ থালায়। তারপর পরের তাঁবুর উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাক।

'দেখছি, বেশ দক্ষ তো,' মন্তব্য করল তারিউ।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যানেজারের মুখ। 'তাই না? এই ক্যাম্পে আমরা সবাই আসলে দক্ষতায় বিশ্বাস করি।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। কতকগুলো বাদুড় ক্যাম্পের ওপর ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। দেয়ালের বাইরে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর। তাঁবুগুলোর সামনে থেকে ভেসে আসছে প্লেটের ওপর চামচ নাড়াচাড়ার শব্দ।

ছয়

শেষ হয়ে এল নভেম্বর মাস। সকালে এখন বেশ শীত শীত করে। কিন্তু সন্ধ্যায় আবার গরম হয়ে ওঠে বাতাস। এক সন্ধ্যায় তারিউ ঠিক করল ওর জীবনের সব কথা রিওকে শোনাবে। রাত দশটায় ও রিওকে বলল, 'চলুন, আপনার সেই হাঁপানি রোগীর বাসা থেকে ঘুরে আসি।'

ওদের দেখে বক্তৃতা দিতে শুরু করল বুড়ো, 'শহরের লোকেরা আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠছে। চিরদিন সেই একই শ্রেণীর মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। অনির্দিষ্টকাল ধরে এই অবস্থা চলতে পারে না।' এরপর হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'আবার হৈ-হুল্লোড়ের দিন ফিরে আসবে।'

এমন সময় ছাদে পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা। বুড়োর স্ত্রী বলল, পাশের বাসার মেয়েরা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহিলা আরও জানাল, ছাদ থেকে চারপাশের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়।

'যান না, ওপরে গিয়ে দেখে আসুন চারপাশে কী মজার দৃশ্য,' স্ত্রীর কথা সমর্থন করল বুড়ো, 'কী চমৎকার বাতাস।'

ওপরে উঠে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। কেবল তিনটি চেয়ার আছে ওখানে। যতদূর চোখ যায় শুধু ছাদ আর ছাদ। সবচেয়ে দূরের ছাদটা ঠেকে আছে শহরের সবচেয়ে কাছের পাহাড়টির গায়ে। রাতের আবহাওয়ায় আকাশ তখন একেবারে পরিষ্কার, তারাগুলোকে মনে হচ্ছে রূপার পাত। বন্দরের লাইট হাউস থেকে ছড়িয়ে পড়েছে হলুদ আলো। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা।

'হ্যাঁ। সত্যিই চমৎকার,' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল রিও।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল তারিউ। একটুক্ষণ চুপ থাকার পর ও বলল, 'হ্যাঁ। ঠিক।' রিও-র পাশের চেয়ারটাতে বসল ও।

'আচ্ছা, রিও,' বলল তারিউ, 'আপনি কখনও জানার চেষ্টা করেছেন আমি কে? আপনাকে আমি বন্ধু ভাবতে পারি?'

'কেন নয়! আমরা তো বন্ধুই। শুধু সেটা জানানোর সময় এবং সুযোগ আমাদের ঘটেনি।'

'যাক। আশ্বস্ত হলাম। এই বন্ধুত্বের খাতিরে যদি আমরা

ঘণ্টাখানেকের জন্যে ছুটি নিই?'

হাসল রিও। 'বেশ। তাই হবে।'

'জীবন আরম্ভ করেছিলাম মোটামুটি ভাল ভাবেই। যে কাজে হাত দিতাম তাতেই সফল হতাম। মেয়েদের সাথে খুব সহজেই সম্পর্ক গড়ে উঠত, তেমনি ছাড়াছাড়িও হয়ে যেত খুব সহজে।

'আপনার মত দারিদ্র্যের ভেতর আমাকে শৈশব কাটাতে হয়নি। আমার বাবা ছিলেন সরকারি উকিল। যেমন দয়ালু তেমনি সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। আর মা ছিলেন সরল, এবং কিছুটা লাজুক। অবশ্য আমার বাবা আদর্শ স্বামী ছিলেন না। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাঁর আচরণ কখনোই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত না। সব ব্যাপারেই তিনি মধ্যপথ অনুসরণ করতেন।

'আমার বাবার একটা বিশেষত্ব ছিল। বিছানায়, তাঁর হাতের পাশে সবসময় থাকত ট্রেনের সময়সূচি। যেসব প্রশ্নে স্টেশন মাস্টাররা রীতিমত মাথা চুলকায় সেগুলোর উত্তর বাবা চটপট দিয়ে দিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি বসে পড়তেন তাঁর ওই জ্ঞান বাড়ানোর সাধনায়, এ নিয়ে তাঁর এক ধরনের গর্ববোধও ছিল। বাবার এই অদ্ভুত শখ দেখে আমি ভীষণ মজা পেতাম। দুজনে মেতে উঠতাম রেল ভ্রমণের এক অদ্ভুত খেলায়। এভাবে আমাদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

'বয়স আমার তখন সতেরো, বাবা একদিন বললেন কোর্টে গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে হবে। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন এতে আমি উকিল হিসেবে তাঁর নৈপুণ্য দেখার সুযোগ পাব, আর আদালতের জাঁকজমক দেখে প্রভাবিত হব, এবং ওকালতিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করার উৎসাহ বোধ করব।

'আদালতের যে ছবিটা চিরদিনের জন্যে আমার মনে গেঁথে যায় তা হচ্ছে আসামির কাঠগড়ায় সেদিন যে আসামি দাঁড়িয়েছিল তাঁর

চেহারা। মাথায় ধূসর চুল, বয়স তিরিশ। দেখে মনে হচ্ছিল ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে সে, এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আমি লোকটার অবস্থা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা হলদে পেঁচা, যে হঠাৎ করে প্রচুর আলোর মধ্যে এসে দিশেহারা হয়ে হারিয়ে ফেলেছে তার দৃষ্টিশক্তি। ডানহাতের একটা নখ বারে বারে কামড়াচ্ছিল সে।

'হৃদয়ের গহিনের একটা খামচি অনুভব করেছিলাম আমি। আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেই তুচ্ছ লোকটা। আশেপাশে কে কী বলছে কিছুই আমার কানে ঢুকছিল না। শুধু উপলব্ধি করছিলাম, চারপাশের সবাই ওই লোকটির প্রাণ নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা আদিম অনুভূতির প্রবল জোয়ার আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অপরাধী ওই মানুষটার পাশে।

'লাল গাউন পরা আমার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। দয়ালু ব্যক্তিটি হারিয়ে গেছে তাঁর ভেতর থেকে। দীর্ঘ এক একটা বাক্য বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ দিয়ে। আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে জুরিদের কাছে আবেদন জানালেন তিনি।

'সেদিনের পর থেকে বাবার শখের সেই ট্রেনের সময়সূচিটা চোখে পড়লেই আমার সারা শরীরে বয়ে যেত ঘৃণার একটা স্রোত। আদালত, আইন, বিচার, মৃত্যুদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা, এগুলো সম্পর্কে দারুণ একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠল আমার ভেতর। উপলব্ধি করলাম ওইসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় মাঝেমাঝে বাবাকেও উপস্থিত থাকতে হয়। সেই দিনগুলোতে খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তিনি। আর এজন্যে রাতেই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতেন।

'তারপরে প্রায় এক বছরের মত ওই বাড়িতে ছিলাম আমি। হঠাৎ একদিন বাবা আমার কাছ থেকে অ্যালার্ম ঘড়িটা চাইলেন। বললেন, পরের দিন খুব ভোরে তাকে ঘুম থেকে জাগতে হবে। সে রাতে আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি। পরের দিন বাবা বাসায় ফেরার আগেই আমি ওখান থেকে পালিয়ে আসি।

'বাইরে থাকার সময় হঠাৎ একদিন তাঁর একটা চিঠি পেলাম। আমি দেখা করলাম। আমার পালিয়ে যাবার কোন কারণ না দেখিয়ে খুব শান্তভাবে বললাম, তিনি আমাকে ফিরে আসতে বাধ্য করলে আমি আত্মহত্যা করব। অনেক বক্তৃতা, অনেক উপদেশ দেয়ার পর শান্ত হলেন তিনি। এটুকু বুঝেছিলাম প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন বাবা। বেশ কিছুদিন পরপর আমি মাঝে মাঝে মা-র সঙ্গে দেখা করতাম। তখন বাবার সঙ্গেও দেখা হত। তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাত। বাবা মারা যাবার পর মাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। তিনিও মারা গেছেন, নাহলে এখনও আমার সঙ্গেই থাকতেন।

'আঠারো বছর বয়সে দারিদ্র্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কিন্তু তখন এসব ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ ছিল না, আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ। আসামির কাঠগড়ায় সেই যে পেঁচাটাকে একদিন দেখেছিলাম, তারই সাথে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলাম জীবনে। আমার মনে হত চারপাশের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই অন্যায় মৃত্যুদণ্ডাদেশের ওপর। আমি একটা রাজনৈতিক দলে যোগ দেই। আমার জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে এদের সঙ্গে। ইউরোপে এমন দেশ খুব কমই আছে যার গণআন্দোলনে আমি অংশ নিইনি।

'আমাদের দলও মাঝে মাঝে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিত। আমাদের বোঝানো হত যেখানে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বলে কিছুই থাকবে না

তেমন পৃথিবীকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এই ধরনের কিছু কিছু মৃত্যু মেনে নিতেই হবে। কিন্তু আমার ভেতর এ নিয়ে সংশয় দানা বাঁধছিল। তারপর এল সেই দিনটা যেদিন আমার চোখের সামনে একজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হলো। ঘটনাটা ঘটেছিল হাঙ্গেরিতে।

'বধ্যভূমিতে লোকটিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বুকের যে জায়গায় হৃৎপিণ্ড থাকে, সেই জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল একসঙ্গে কয়েকজন। বুকের ওপর যে ছিদ্রটা হয়েছিল তাতে একটা হাত ঢুকতে পারত। এরপর থেকে কোনো রাতেই আমি ঠিকমত ঘুমোতে পারিনি।

'আমার মনে হত আমি নিজেও পরোক্ষভাবে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। এ-ভাবে আমার জীবন হয়ে উঠল নিঃসঙ্গ। সবার মাঝে থাকলেও এই একাকিত্ব কাটত না।

'আজও আমার ওই মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। বছরের পর বছর ধরে মনে মনে আমি লজ্জা অনুভব করে আসছি। অনুভব করেছি, আমার যত সদিচ্ছাই থাক না কেন, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও আমি নিজেও হত্যাকারীদের একজন। তাই ঠিক করেছি, মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে বা মৃত্যুতে সাহায্য করতে পারে এমন কোনকিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াব না কখনও।

'আমার এখনকার কর্তব্য, আপনার পাশে থেকে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। রিও, আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি, এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা আমাকে নতুন করে জানতে হবে–শিখতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রিও প্রশ্ন করল, 'জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্যে মানুষের কোন পথ অনুসরণ করা উচিত, সে ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল তারিউ, 'সহানুভূতির পথ।'

এতক্ষণ ধরে যে মৃদু বাতাস বইছিল সেটা এখন একটু জোরে বইতে শুরু করল। সমুদ্র থেকে একটা দমকা হাওয়া উঠে এসে আশেপাশের বাতাসকে লোনা গন্ধে ভরিয়ে তুলল। ওরা শুনতে পেল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে।

'আমার এখন একমাত্র আগ্রহ, মানুষ কীভাবে মহাপুরুষ হয় তা জানা,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল তারিউ।

'কিন্তু তুমি তো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না।'

'হ্যাঁ। আর সমস্যাটা সেখানেই। আজকে, আমাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা এটাই।'

ওরা কতকগুলো কণ্ঠের কোলাহল শুনতে পেল, আর সেই সঙ্গে একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর আবার শুনতে পেল ক্রুদ্ধ জনতার চিৎকার।

'ফটকের সামনে নিশ্চয় গোলমাল বেধেছে,' বলল তারিউ।

'তাই মনে হচ্ছে। তবে এতক্ষণে থেমে গেছে বোধহয়,' বলল রিও।

'এসব গোলমাল কোনদিনই থামবে না, বরং বাড়বে; এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।'

'হয়তো তাই। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমি সত্যিকারের সহানুভূতি অনুভব করি পরাজিত মানুষের জন্যে, মহাপুরুষদের জন্যে নয়। বীরত্বের কোন মূল্য আমার হৃদয়ের কাছে নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ এটাতেই আমি সবচেয়ে আগ্রহী।'

'হ্যাঁ, আমাদের দুজনের লক্ষ্যই হয়তো এক, কেবল পার্থক্য, আপনার মত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই।'

রিও ভাবল তারিউ হয়তো ঠাট্টা করছে। ও হাসতে হাসতে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় দেখল ওর মুখে লেগে আছে বিষাদ আর আন্তরিকতার ছাপ।

'কি ভাবছেন,' বলল তারিউ, 'বন্ধুত্বের খাতিরে আমাদের এখন কী করা উচিত?'

'আপনি যা চান তাই করব।'

'চলুন, একটু সাঁতার কেটে আসি। এমন নিষ্পাপ আনন্দ মহাপুরুষরাও উপভোগ করতে পারে। আপনার কী মনে হয়?'

আবার হাসল রিও। তখনও কথা শেষ হয়নি তারিউ-এর, বলল, 'পরিচয়পত্র সঙ্গেই আছে, বাইরের জেটি পর্যন্ত যেতে অসুবিধে হবে না। দিন রাত এই প্লেগের মধ্যে বসে থেকে শুধু প্লেগের কথা চিন্তা করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। যারা প্লেগের শিকার তাদের বাঁচানোর জন্যে আমরা অবশ্যই সংগ্রাম করব, কিন্তু এর বাইরে আর কিছু ভাবতে না পারলে এ সংগ্রাম তো অর্থহীন।'

'ঠিক বলেছেন। চলুন, যাই।'

কয়েক মিনিট পরে ওদের গাড়ি থামল ফটকের সামনে। পাহারাদারকে দেখাল পরিচয়পত্র। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওগুলো ফেরত দিল ওদের হাতে।

ফটকের বাইরে অনেকটা খোলা জায়গা, সেখানে অনেকগুলো বড় বড় পিপা ছড়ানো। সেটা পেরিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। বাতাস মদ আর মাছের আঁশটে গন্ধে ভারি। একটু পরে ওদের নাকে ভেসে এল আইডিন এবং সামুদ্রিক আগাছার গন্ধ। বুঝতে পারল সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেছে ওরা। এমন সময় শুনতে পেল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বড় বড় উপলখণ্ডের গায়ে।

জেটির ওপর উঠতেই ওরা দেখতে পেল সামনে বিস্তৃত সমুদ্র, ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। একটা পাথরের ওপর বসল দুজনা।

মন্থর গতিতে উঠছে আর নামছে শান্ত ঢেউ, চিক্‌চিক্‌ করছে আলোর প্রতিফলনে; কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে, এরপর ভেঙে চুরমার হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে। সামনে দিগন্তব্যাপী ঘন অন্ধকার। হাতের তালুতে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের স্পর্শ অনুভব করল রিও। হঠাৎ এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল ওর মন। তারিউ-এর দিকে চোখ ফিরিয়ে ওর মুখেও একই প্রশান্তির ছাপ দেখতে পেল ও।

কাপড়চোপড় খুলে ফেলল ওরা। প্রথমে ঝাঁপ দিল রিও। ডোবার সময় পানি মনে হলো ঠাণ্ডা, কিন্তু ভেসে ওঠার পর অত ঠাণ্ডা লাগল না। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর রাতের সমুদ্রকে বেশ উষ্ণই মনে হলো ওর। পিছনে পানি উছলে ওঠার শব্দ শুনল ও। অনুমান করল, ঝাঁপ দিয়েছে তারিউ। চিত হয়ে মরার মত পানির ওপর শুয়ে থাকল ও। মাথার ওপর বিশাল আকাশ, চাঁদ আর অসংখ্য তারায় ঝলমল করছে। তারিউ-এর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল ও।

আবার উপুড় হলো রিও। পাশাপাশি সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল দুই বন্ধু। তারিউ ওর চেয়ে অনেক ভাল সাঁতারু। একই তালে পা পড়ছে দুজনের। বাইরের পৃথিবী থেকে এখন ওরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শহরের দূষিত পরিবেশ আর প্লেগের ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে।

প্রথমে থামল রিও। আবার জেটির দিকে ধীরে ধীরে ফিরতে আরম্ভ করল ওরা। এক জায়গায় এসে হঠাৎ বরফের মত হিম স্রোতের মাঝখানে পড়ে গেল দুজনে। ফাঁদে পড়ে শক্তি চাড়া দিয়ে উঠল ওদের; জোরে জোরে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল ওরা। জেটিতে উঠে কাপড়চোপড় পরে নিয়ে ফিরে চলল শহরে। আবার তুলে নিতে হবে কাজের দায়িত্ব।

সাত

সারাটা ডিসেম্বর মাসই ধকধক করে জ্বলল প্লেগের আগুন। শহরের বাইরে লাশ পোড়ানোর শ্মশানটাকে দিনরাত তার খোরাক জুগিয়ে চলল প্লেগ, আর শত শত মানুষকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় গৃহহারা করে পাঠাল ক্যাম্পে ক্যাম্পে। ঝাঁকি খেতে খেতে, অথচ নির্ভুলভাবে নিজের পথ চলায় কোন বিরতি দিল না প্লেগ। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন শীত শুরু হলে প্লেগের এই একটানা গতিতে কিছুটা বাধা আসবে, এই আশায় আশায় শেষ হয়ে গেল শীতের প্রথম ঝলক, কিন্তু প্লেগের দাপাদাপি একটুও কমল না।

শহরে খোলা হলো আর একটা হাসপাতাল। অবস্থা এমন দাঁড়াল, রিও রোগী ছাড়া আর কারও সঙ্গেই কথা বলার সুযোগ পায় না। নিউমোনিয়া-প্লেগের সংখ্যা বাড়ার ফলে রোগীদের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করল ও। এখন সব ব্যাপারেই ও যা করতে চায় সেগুলোকে ওরা মেনে নেয়। আগে, আক্রান্ত হবার সময় কেমন যেন নেতিয়ে পড়ত, আর নয়তো একটা উন্মত্ত ভাব দেখাত। এখন ওরা নিজেরাই ওর কাছে জানতে চায় কী করলে ওদের উপকার হবে। সবসময় পানীয় কিছু খেতে চায়, শরীর গরম রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলে; নাহলে ঝগড়া-ঝাঁটি করে; জেদাজেদি করে।

ডিসেম্বরের শেষে রিও মসিয়ে অথন-এর কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। তিনি লিখেছেন: তাঁর ক্যাম্পে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে, তবু তাঁকে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে, কারণ তাঁর ক্যাম্পে আসার তারিখটা নিয়ে গোলমাল বেধেছে; মাদাম অথন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাবার পর এ নিয়ে প্রিফেক্ট-এর অফিসে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, তারা তাকে জানিয়েছে অফিসের কাজে কখনও ভুল হয় না; ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে রিওকে তিনি অনুরোধ করেন।

কয়েকদিন পর ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন মসিয়ে অথন। এর মধ্যেই অনেক রোগা হয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

'কিছু করার কথা চিন্তা করেছেন?' জানতে চাইল রিও। 'নিশ্চয় অফিসে অনেক কাজ জমেছে।'

'ভাবছি কিছুদিন ছুটি নেব।'

'ঠিক বলেছেন। আপনার কিছুদিন বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'না। সেজন্যে নয়। আমি আবার ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাই।'

রিও ভাবল কথাটা ভুল শুনেছে ও। না বলে পারল না, 'এই তো ক'দিন আগে বেরিয়ে এলেন।'

'মাফ করবেন। কথাটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। শুনেছি কিছু কিছু সরকারি কর্মচারী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ক্যাম্পে কাজ করছে। আমি ওদের সাহায্য করতে চাই। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই। তাছাড়া, কথাটা একটু অদ্ভুত শোনাবে, এতে আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পাব যে ছেলেটার সঙ্গে আমার যোগাযোগ এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায়নি।'

রিও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মসিয়ে অথন-এর দিকে। আগের সেই ভাবলেশহীন কঠিন চাহনিতে সত্যিই কী কোন কোমল ভাব এসেছে? হ্যাঁ, সত্যিই তো, চোখ দুটো কেমন ভেজাভেজা,

আগের সেই তীক্ষ্ণতা নেই।

'হ্যাঁ। অবশ্যই,' বলল রিও, 'আপনি যখন চাইছেন, আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

বড়দিনের পর্ব না আসা পর্যন্ত শহরের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন এল না। র‍্যাবেয়া একদিন চুপি চুপি রিওকে বলল, সেই দুই পাহারাদার ছোকরার মাধ্যমে সে তার প্রেমিকার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে, এবং উত্তরও পেয়েছে; রিও-ও ইচ্ছে করলে গোপনে চিঠি পাঠাতে পারে।

দীর্ঘ কয়েক মাস পর এই প্রথম চিঠি লিখতে বসল রিও। কিন্তু কাজটা বড় কঠিন আর পরিশ্রমের বলে মনে হলো ওর। বহুদিনের বিস্মৃত একটা ভাষাকে নানা কৌশলে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল ও। শেষ পর্যন্ত চিঠিটা শেষ করতে পারল এবং পাঠিয়ে দিল গোপন পথে। তবে উত্তর আসতে দেরি হলো অনেক।

আগের মতই দিন দিন ফেঁপে উঠছে কটার্ড। চোরাকারবার থেকে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছে ও। কিন্তু গ্রাঁদ বড়দিনের আয়োজনের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না।

অন্যান্য বছরের বড়দিনের উৎসবের সাথে এবারের বড়দিনের কোন মিল নেই। দোকানগুলো শূন্য, আলো নেই। মিষ্টির দোকানে চোখে পড়ে নকল চকলেট, আর নয়তো কালি ঠোঙ্গা। ট্রাম যাত্রীদের চোখমুখে ফুটে আছে উদাসীনতার ছাপ। এ-বছর শুধু বড়লোকরাই এই উৎসব উদযাপন করল, তবে প্রকাশ্যে নয়। লজ্জায়, লুকিয়ে লুকিয়ে দোকানের পিছনে বসে অথবা নিজের ঘরের মধ্যে বসে মদ খেলো। গির্জায়, আনন্দগীতির চেয়ে প্রার্থনাই বেশি করে করা হলো।

এক সন্ধ্যায় হাসপাতালে কাজ করতে এল না গ্রাঁদ। এতে বেশ

চিন্তিত হয়ে পড়ল রিও। সকালে উঠেই ওর বাসায় গিয়ে হাজির হলো ও। কিন্তু গ্রাঁদকে খুঁজে পেল না কোথাও। ওকে খোঁজার জন্যে সবাইকে অনুরোধ করে এল রিও।

সন্ধ্যায়, র‍্যাঁবেয়া হাসপাতালে এসে বলল অনেক দূর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে গ্রাঁদকে দেখতে পেয়েছিল ও; উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল, চেহারাও কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল; কিন্তু চোখে পড়তে না পড়তেই ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যায় ও, অনেক চেষ্টা করেও র‍্যাঁবেয়া ওকে খুঁজে বের করতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরোল তারিউ এবং রিও।

ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে তখন। একটা কাঠের খেলনার দোকানের সামনে গ্রাঁদকে দেখতে পেল রিও। আলমারির কাচে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রাঁদ, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। দেখেই ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল রিও-র হৃদয়। এই নীরব অশ্রুপাতের কারণ খুব সহজেই বুঝতে পারল ও।

মুহূর্তের মধ্যে বহুদিনের পরিচিত একটা দৃশ্য ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। গল্পটা গ্রাঁদই ওকে বলেছিল। এক বড়দিনের উৎসবে সুন্দর পোশাক পরে একটা দোকানের কাচের আলমারির সামনে দাঁড়িয়েছিল গ্রাঁদ এবং জেনি। হঠাৎ আবেগের জোয়ারে জেনি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কত সুখী আমি। রিও অনুভব করল, গ্রাঁদ-এর কানে বাজছে এখন জেনির সেই কণ্ঠ। গ্রাঁদ কী ভাবছে সেটাও অনুভব করতে পারল ও। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন কাজের দায়িত্ব, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা সবকিছুকে মনে হয় ক্লান্তিকর, বেদনাদায়ক বোঝা।

কাচের ওপর রিও-র প্রতিফলন দেখতে পেল গ্রাঁদ। তখনও নীরবে কাঁদছে ও। এবার ঘুরে দাঁড়াল, দোকানের সামনে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওর জন্যে।

'ডাক্তার, ডাক্তার...,' আর কিছুই বলতে পারল না গ্রাঁদ। রিও-র মুখ দিয়েও কোন কথা বেরুতে চাইল না।

'সবই বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি আপনার দুঃখ কোথায়।'

'শুধু যদি একবার ওকে চিঠি লেখার সুযোগ পেতাম। শুধু একবার যদি ওকে জানাতে পারতাম...ও যেন সুখী হয়...মনের ভেতর কোন ক্ষোভ যেন পুষে না রাখে।'

হাত ধরে ওকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল রিও। গ্রাঁদও কোন বাধা দিল না। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, 'ডাক্তার, সবাই জানে, আমি খুব শান্ত আর সাধারণ মানুষ। কিন্তু এটা প্রমাণ করার জন্যে কী কঠিন চেষ্টাই না করতে হয়েছে আমাকে। অথচ আজ, সেই চেষ্টাটুকু করার ক্ষমতাও আমার আর নেই।'

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াল গ্রাঁদ। থরথর করে কাঁপছে ওর শরীর। জ্বর এলে যেমন হয় তেমনি জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। ওর একটা হাত মুঠোর ভেতর নিয়ে রিও-র মনে হলো প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গ্রাঁদ-এর শরীর।

'এক্ষুণি আপনাকে বাসায় ফিরতে হবে,' বলল রিও। কিন্তু দৌড়াতে আরম্ভ করল গ্রাঁদ। কয়েক পা দৌড়ে থমকে দাঁড়াল ও; দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে একবার এপাশে একবার ওপাশে দুলতে লাগল। তারপর একটা চক্কর খেয়ে পড়ে গেল ওখানেই। দুচোখ দিয়ে তখনও গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু। চোখে-মুখে জমেছে ময়লা। পথাচারীদের কেউ কেউ থেমে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে দৃশ্যটা, তারপর আগের মতই এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, কাছে আসার সাহস করল না কেউ। রিও এসে ওকে তুলে নিয়ে গেল গাড়িতে।

বিছানায় শুয়ে আছে গ্রাঁদ। শ্বাস নিতে পারছে না, ফুসফুস বন্ধ হয়ে আসছে। চিন্তায় পড়ে গেল রিও। বাড়িতে কোন লোকজন নেই। তাই ওকে হাসপাতালে নেয়ার দরকারও নেই। তারিউ সাথে

থাকলে ওরা দু'জনেই ওর দেখাশোনা করতে পারবে।

বালিশের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে গ্রাঁদ-এর মাথাটা। দুই গালে একটা ধূসর সবুজাভা। চোখ দুটো ঘোলাটে, দৃষ্টিহীন। একটা ভাঙা পুরনো কাঠের বাক্স দিয়ে আগুনের ব্যবস্থা করছে তারিউ। সেই দিকে তাকিয়ে আছে গ্রাঁদ। 'আমার অবস্থা বোধহয় খুব খারাপ,' বিড়বিড় করে বলল ও। কথা বলার সময় ফুসফুস দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছে। ওকে কথা বলতে নিষেধ করল রিও। যাওয়ার সময় কথা দিল খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ও। একটু ফাঁক হলো গ্রাঁদ-এর ঠোঁট দুটো। এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল সেই ফাঁকে। 'ডাক্তার, টুপি খুলে অভিবাদন জানাচ্ছি, আবার যেন সুস্থ হয়ে উঠতে পারি,' কথাগুলো শেষ করতে না করতেই আবার নেতিয়ে পড়ল গ্রাঁদ।

কয়েক ঘণ্টা পর ওরা ফিরে এসে দেখে বিছানায় হেলান দিয়ে উঠে বসেছে গ্রাঁদ। আগের চেয়ে ওকে অনেক শান্ত মনে হচ্ছে। টেবিলের ড্রয়ার থেকে ওর লেখার পাণ্ডুলিপিটা বের করার জন্যে ওদের অনুরোধ করল ও।

তারিউ পাণ্ডুলিপিটা ওর হাতে দিতেই ও ওটাকে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। তারপর রিও-র হাতে দিয়ে ইশারায় ওকে অনুরোধ করল পড়তে। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মত পাণ্ডুলিপিটা। বেশির ভাগ পাতায় একই কথাকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। মে মাস, এক অশ্বারোহিণী মহিলা, বল্‌গনা অ্যাভিন্যু, এ-কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে; বিভিন্ন ভাবে তাদের সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আছে অনেক নোট, ব্যাখ্যা। শেষ পাতার নিচে অত্যন্ত পরিষ্কার করে লেখা: প্রিয়তমা জেনি, আজ বড়দিন...আর...। পাতার ওপরে লেখা ওর সেই প্রিয় বাক্যটির সর্বশেষ সংশোধিত রূপ। 'পড়ে দেখুন না,' বলল গ্রাঁদ। রিও পড়ল: 'মে মাসের এক সুন্দর প্রভাতে ক্ষীণাঙ্গী

তন্বী এক অশ্বারোহিণীকে বল্‌গনা অ্যাভিন্যু ধরে উজ্জ্বল পাটল রঙের এক মাদি ঘোড়ায় চেপে অনেকেই যেতে দেখে থাকতে পারেন। তার চারপাশে পুষ্পের...'

'এরকমই লেখা আছে, না?' জ্বরে কাঁপছে গ্রাঁদ-এর স্বর। রিও ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বিছানায় ছটফট করতে লাগল গ্রাঁদ। 'হ্যাঁ। আমি জানি আপনি কী ভাবছেন এখন। "সুন্দর" শব্দটা ঠিক হয়নি। তাই...' রিও খুব শক্ত করে চেপে ধরল ওর হাত দুটো।

'থাক, ডাক্তার, থাক। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর সময় কোথায়...,' প্রচণ্ড বেগে ওঠানামা করতে আরম্ভ করল ওর বুক। তারপর চিৎকার করে উঠল ও, 'পুড়িয়ে ফেলুন ওটাকে, পুড়িয়ে ফেলুন।'

ইতস্তত করতে লাগল রিও। কিন্তু গ্রাঁদ ওর যন্ত্রণাকাতর গলা দিয়ে অত্যন্ত জোরে জোরে পুনরাবৃত্তি করতে লাগল কথাগুলো। চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আগুনের মধ্যে পাণ্ডুলিপিটা ছুঁড়ে মারল রিও। দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। আলোয় ভরে গেল ঘর। ওদের দিকে পিঠ ফিরে শুয়ে পড়ল গ্রাঁদ। দেয়ালে ঠেকল ওর মুখ। সিরাম দেয়া হলো ওকে। 'রাতটাও টিকবে কিনা সন্দেহ,' তারিউ-এর কানে কানে বলল রিও। রাতে, ওখানেই থেকে গেল তারিউ।

সারারাত গ্রাঁদ-এর আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় ছটফট করল রিও। কিন্তু সকালে গিয়ে দেখে বিছানায় বসে আছে ও, গল্প করছে তারিউ-এর সঙ্গে। জ্বর নেই। নেতিয়ে পড়ার ভাবটা ছাড়া রোগের অন্য কোন লক্ষণও নেই।

'দেখুন, ডাক্তার,' গ্রাঁদ বলল, 'আবার শুরু করব লেখাটা।'

রিও তাকাল তারিউ-এর দিকে। ওকে তখন কুরেকুরে খাচ্ছে সন্দেহ। 'অপেক্ষা করে দেখা যাক কী দাঁড়ায়,' বলল তারিউ।

দুপুরের পরেও অবস্থার পরিবর্তন হলো না। সন্ধ্যার পর গ্রাঁদকে সম্পূর্ণরূপে বিপদমুক্ত মনে হলো। এ ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়ল রিও। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। এর কয়েকদিন পর প্লেগ আক্রান্ত এক মেয়েকে নিয়ে আসা হলো হাসপাতালে। পরীক্ষা করে ও দেখল বাঁচার কোন আশাই নেই মেয়েটার। মুমূর্ষু রোগীর ওয়ার্ডে পাঠানো হলো ওকে। মেয়েটা প্রলাপ বকছিল, এবং নিউমোনিয়া-প্লেগের সব লক্ষণই ছিল ওর মধ্যে। কিন্তু পরের দিন সকালে ওর জ্বর নেমে গেল। দুপুরেও তাপ বাড়ল না। পরের দিন সকালে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আরম্ভ করল ও। পরের সপ্তাহে এ-ধরনের আরও চারটা কেস দেখতে পেল রিও।

সপ্তাহের শেষ দিনে তারিউ এবং রিও গেল সেই হাঁপানি রোগীর বাসায়। উত্তেজনায় ছটফট করছিল বুড়ো। 'বিশ্বাস করুন, ওগুলো আবার বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।'

'কার কথা বলছেন?'

'কেন, ইঁদুর।'

'এপ্রিলের পর থেকে একটা ইঁদুরও কারও চোখে পড়েনি,' রিওকে বলল তারিউ। ওকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাল।

'তার মানে আবার নতুন করে প্লেগ শুরু হতে যাচ্ছে?' প্রশ্ন করল রিও।

অভ্যাসমত হাত কচলাতে আরম্ভ করল বুড়ো হাঁপানি রোগী। 'বুঝলেন, ডাক্তার সাহেব; ইঁদুরগুলো যেভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, সত্যি তা দেখার মত।'

রিও নিজেও দুটো ইঁদুরকে বাইরের দরজা দিয়ে বাসার ভেতর ঢুকতে দেখল। ওর প্রতিবেশীরা অনেকেই ওকে বলল, তারাও তাঁড়ার ঘরে আবার ইঁদুর দেখতে পেয়েছেন। কোন কোন বাসায়

শোনা গেল ইঁদুরের কিচ্ কিচ্ শব্দ।

প্রতি সোমবারে মৃত্যুর পরিসংখ্যান ঘোষণা করা হয়। গভীর আগ্রহে সেই ঘোষণা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল রিও। কিন্তু ঘোষণায় বলা হলো, মৃত্যুর সংখ্যা কমে গেছে।

পঞ্চম পর্ব

এক

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে একটা ঠাণ্ডা আবহাওয়া টানা বেশ কয়েকদিন আঁকড়ে ধরে রাখল শহরটাকে। ধবধবে হয়ে উঠল রাস্তাঘাটের চেহারা। হিম শীতল বাতাসে ঝিমিয়ে পড়ল প্লেগের প্রকোপ। পরপর তিন সপ্তাহের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেল মৃত্যুর হার সত্যিই কমে গেছে। মনে হলো প্লেগ তার স্বৈরাচারী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ডাক্তার ক্যাসেল-এর তৈরি সিরাম ব্যবহার করলে এখন অনেক ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই চরম প্রত্যাশার মুহূর্তেও কেউ কেউ প্রাণ হারায়। কোয়ারেনটাইন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়া ম্যাজিস্ট্রেট মসিয়ে অথন তাদেরই একজন।

আগের মত এখনও দিনের বেলায় রাস্তাঘাট শূন্য থাকে। কিন্তু রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার লোকজনে ভরে ওঠে ওগুলো। সবার গায়ে ওভারকোট। একটু ভালভাবে লক্ষ করলে চোখে পড়ে, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ মুছে গেছে সবার চেহারা থেকে। মাঝে মাঝে হাসতে দেখা যায় ওদের। তবে এখনও কিছু কিছু লোক ফটকের পাহারাদারদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে শহর থেকে পালাবার চেষ্টা করে।

জিনিসপত্রের দাম খুব তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করল। যেসব মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল তাদের আবার এক সঙ্গে বাস করার সুযোগ দেয়া হলো। সৈনিকরা ফিরে গেল ব্যারাকে।

পঁচিশ তারিখের আগেই সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল। কর্তৃপক্ষ মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে ঘোষণা করলেন: 'মহামারীকে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসেছি।' সরকারি ইস্তেহারে বলা হলো: 'আরও দুসপ্তাহের জন্যে শহরের ফটক বন্ধ রাখা হবে; এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যেসব বিধিনিষেধ এতদিন ধরে চালু রয়েছে, সেগুলো আরও এক মাস বলবৎ থাকবে।' পঁচিশ জানুয়ারির রাত একটা উৎসবের রাতে পরিণত হলো।

প্রিফেক্ট নিজেও এই আনন্দে যোগ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন: আজ থেকে রাস্তার সমস্ত আলো জ্বালানো হবে।

আলোকিত শহরের রাস্তায় দলে দলে নেমে পড়ল কোলাহল-মুখর উৎফুল্ল জনতা। প্রচণ্ড উল্লাসে গান ধরল ওরা। কল্পনায় ওরা শুনতে পেল: হুইসেল দিতে দিতে ট্রেন ছুটে চলেছে শহর ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে, সীমাহীন দূরত্বের সন্ধানে; হুঙ্কার দিতে দিতে বন্দর ছেড়ে জাহাজ ভেসে যাচ্ছে ইস্পাতের মত চকচকে সমুদ্রের বুকে।

সেদিন রাতে, তারিউ, রিও, র‍্যাবেয়া এবং ওদের অন্যান্য সহকর্মী এসে দাঁড়াল ওই আনন্দমুখর জনতার মাঝে। তখন ওদের মনে হলো একটা শূন্যতার ভেতর দিয়ে ভেসে চলেছে ওরা। বাড়ি ফেরার সময়েও ওদের কানে বাজতে লাগল জনতার উল্লাস।

এক সময় দূরে, বড় রাস্তার ওপর, জনতার উল্লাসধ্বনি ফেটে পড়ল সমুদ্র গর্জনের মত। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল

তারিউ। দেখতে পেল ছোট্ট একটা উজ্জ্বল চকচকে প্রাণী লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে বড় রাস্তাটা। বিড়াল। বসন্তের পর এই প্রথম বিড়াল চোখে পড়ল ওর। বিড়ালটা রাস্তার মাঝখানে থামল একবার, ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, একটা পা তুলে চাইল কয়েকবার, তারপর সেই পা-টাকে ডান কানের ওপর দিয়ে খুব দ্রুত ঘুরিয়ে আনল; আবার এগুতে লাগল সামনের দিকে এবং হারিয়ে গেল অন্ধকারে। হাসল তারিউ। ভাবল: ব্যালকনির সেই বুড়ো দৃশ্যটা দেখতে পেলে নিশ্চয় খুব খুশি হতেন।

দুই

পঁচিশ জানুয়ারির কয়েকদিন পর তারিউ এক দুপুরে সেই ছোট্ট রাস্তাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন বুড়ো ভদ্রলোক ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসবেন। বিড়ালগুলোকে দেখতে পেল ও। নিজের জায়গায় আবার ফিরে এসেছে ওরা, ব্যালকনির ছায়ায় শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। কিন্তু এ সময় ব্যালকনির আশেপাশের যে জানালাগুলো খোলা থাকার কথা, সেগুলো তখনও বন্ধ আছে। তারিউ আর কোনদিন জানালাগুলোকে খুলতে দেখেনি। এ থেকে ও ধারণা করে বুড়ো ভদ্রলোক হয় মারা গেছেন, নয়তো অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

সবাই যখন ভাবছেন প্লেগ পরাজিতের মত পিছু হটতে শুরু

করেছে, আত্মগোপন করতে চাইছে পালিয়ে, সেই অন্ধকার গুহায় যেখান থেকে সে একদিন বেরিয়ে এসেছিল, তখন একজন মানুষ প্লেগের এই পরাজয়ে ভয় পেয়ে গেল। সেই মানুষটার নাম কটার্ড।

মৃত্যুর সংখ্যা যখন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কমতে আরম্ভ করল, তখন কটার্ড বেশ কয়েকবার বিভিন্ন অজুহাতে রিও-র সঙ্গে দেখা করে। ওর উদ্দেশ্য ছিল মহামারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আসল খবর জানা। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে রিও ওকে আশার কথা শোনাতে লাগল। কিন্তু এ ধরনের উত্তর ভাল লাগত না ওর, এবং নানা রকমের বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়াও হত। কখনও ক্রোধ প্রকাশ করত, কখনও ভেঙে পড়ত নিরাশায়। কটার্ড-এর এই অবস্থা দেখে একদিন ওকে করুণা দেখানোর জন্যে বাধ্য হয়ে রিও বলল, মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখে মনে হচ্ছে মহামারী দ্রুত গতিতে পিছু হটছে, তবু আমরা যে সত্যি সত্যি সঙ্কট পেরিয়ে এসেছি সে কথা এখুনি নিশ্চিত করে বলা কঠিন। রিও-র এই মতামত সাধারণ মানুষের ভেতর ছড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল কটার্ড। যে অঞ্চলে ও বাস করে সেখানকার দোকানদারকেও কটার্ড এগুলো শোনাল। তবু হতাশা কাটল না ওর। একদিন তারিউকে সে বলল, 'এবার যে-কোনদিন ফটক খুলে দেয়া হবে। তখন দেখবেন সবাই আমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।'

জানুয়ারির প্রথম তিন সপ্তাহে খুব ঘন ঘন পরিবর্তন হলো কটার্ড-এর চালচলনে। কখনও কখনও প্রতিবেশী এবং পরিচিত মানুষদের ভেতর নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করল ও, সে সময় ওদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে লাগল। আবার মাঝে মাঝে দিনের পর দিন সবাইকে এড়িয়ে চলল। এ সময়ে ও নিজের বাসায় আত্মগোপন করে রইল। তখন ওকে রেস্তোরাঁ, থিয়েটার হল, কাফে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। চুপচাপ বাসায়

পড়ে থাকে; পাশের একটা রেস্তোরাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, তারাই ওকে সময়মত খাবার পৌঁছে দিত। টুকিটাকি কিছু কেনার দরকার পড়লে রাতের বেলায় বাইরে যেত ও। আর কেনাকাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, যে-পথে লোকজনের চলাচল কম, আলোর ব্যবস্থা ভাল নয়, সেই পথ দিয়ে চুপি চুপি বাসায় ফিরে আসত। এই লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরার পথে কয়েকবার তারিউ-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারিউ কিছু রূঢ় শব্দ ছাড়া অন্য কোন কথা বের করতে পারেনি ওর মুখ দিয়ে। কয়েকদিন যেতে না যেতে হঠাৎ করে আবার পাল্টে যেত ওর আচরণ। তখন সবার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে ও। মেতে ওঠে প্লেগ নিয়ে আলোচনায়। জানতে চায় মানুষের মতামত। মিশে যায় রাস্তার জনসমুদ্রে।

পঁচিশ জানুয়ারি থেকে আবার আত্মগোপন করল কটার্ড। এর দুদিন পরে হঠাৎ করে দেখা হলো তারিউ-এর সঙ্গে। একটা নির্জন গলিতে একা একা পায়চারি করছিল ও। কটার্ড তারিউকে ওর বাসায় যাবার প্রস্তাব দিল।

হাঁটতে হাঁটতে কটার্ড প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সরকারি ইস্তেহারের অর্থ কি এই যে প্লেগের দ্রুত উপশম হচ্ছে; আপনার কি ধারণা?'

'এটা ঠিক যে সরকারি ইস্তেহার প্রচার করলেই প্লেগের উপশম হয় না। তবে এটাও ঠিক যদি তেমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে প্লেগ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিদায় নেবে। বাইরের অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে,' উত্তর দিল তারিউ।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। যদি তেমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলেই এমনটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু দুর্ঘটনা কিছু না কিছু তো ঘটবেই। তাই না?'

'সে কথা চিন্তা করেই কর্তৃপক্ষ ফটক আরও পনেরো দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন। তবে সবকিছু যেভাবে এগুচ্ছে তাতে কর্তৃপক্ষকে এই ঘোষণা বাতিল করতে হবে।'

'সে রকম কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস শহরের ফটক আবার খুলে দেয়া হবে। এবং সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, এই সম্ভাবনাই বেশি।'

'আপনার কথা না হয় মানলাম, কিন্তু সবকিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, একথায় আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

তারিউ হাসল। 'সিনেমাহলে নতুন ছবি আসবে।'

কিন্তু কটার্ড-এর মুখে কোন হাসি দেখা গেল না। প্রশ্ন করল, 'এত বড় দুর্ঘটনার পরও শহরের জীবনযাত্রার কোনরকম পরিবর্তন হবে না?'

'আমার ধারণা প্লেগের ফলে শহরের অনেক কিছুই বদলে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা নাও হতে পারে। কেননা, মানুষ ভাবতে চাইবে যে কিছুই ঘটেনি, এবং সেভাবেই জীবন শুরু করবে তারা। অবশ্য এটাও ঠিক মানুষ সত্যি সত্যি সব ভুলতে পারে না। মানুষের মনে প্লেগের কিছু স্মৃতি থেকে যাবেই।'

'মানুষের মন নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি জানতে চাই সরকার এবং শাসন ব্যবস্থার কথা। সেগুলোও কি আগের মত চলবে?'

'ওসব ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এত বড় আকস্মিক দুর্ঘটনার পর শাসনযন্ত্রকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেশ সময় লাগবে। তাছাড়া

এখনকার অবস্থায় কিছু নতুন সমস্যা দেখা দেবে, সেগুলো সামলাবার জন্যে শাসন ব্যবস্থায় কিছু না কিছু রদবদল করতেই হবে।'

এবার কটার্ডকে বেশ খুশি-খুশি মনে হলো। তারিউ-এর মন্তব্য ভাল লেগেছে ওর। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন। সবাইকে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে।'

ইতিমধ্যে কটার্ড-এর বাসার কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওরা। কটার্ডকে আগের চেয়ে অনেক উৎফুল্ল মনে হলো। মনে হলো ভবিষ্যৎকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করার মত মনোবল ফিরে পেয়েছে। হয়তো কল্পনা করতে শুরু করেছে: অতীতকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে শহরে একেবারে নতুনভাবে জীবন শুরু হতে যাচ্ছে, সবকিছু নতুন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

তারিউ আবার হাসল। 'দেখবেন, আপনারও সমস্ত অপরাধ ধুয়ে মুছে গেছে। আপনার জন্যেও নতুন সুযোগ আসবে।'

কটার্ড-এর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল দুজনে। 'এখন মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক,' বেশ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল কটার্ড, 'সবাই আবার নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ পাবে।'

সামনের অন্ধকার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল দুজন লোক। অস্পষ্টভাবে তারিউ শুনতে পেল কটার্ড সবিস্ময়ে বলছে, 'এই দুই চিড়িয়া আবার কোত্থেকে আমদানি হলো? কী চায় এরা?' অপরিচিত দুজনের ভেতর থেকে একজন কটার্ডকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কটার্ড?'

একটা চাপা অস্ফুট শব্দ বের হলো কটার্ড-এর মুখ দিয়ে। এবং দেখতে না দেখতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল ও।

তারিউ এবং অপরিচিত লোক দুজন বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারিউ ওদের প্রশ্ন করল, 'কী চান আপনারা?'

'কটার্ড-এর কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চাই,' দায়সারা উত্তর দিল লোক দুটো।

বাসায় ফিরে তারিউ ওর ডাইরিতে এই অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ লিখতে গিয়ে মন্তব্য করল: 'আজ রাতে বড় ক্লান্ত বোধ করছি।'

ওর ডাইরির শেষে এই কথাগুলো লেখা আছে: 'রাত এবং দিনের মধ্যে এমন কতকগুলো নির্দিষ্ট সময় আছে যখন মানুষের শক্তি এবং সাহস নিঃশেষিত হয়ে আসে। এই সব সময়কে আমি ভীষণ ভয় করি।'

তিন

শহরের ফটক খোলার কয়েকদিন আগের ঘটনা। দুপুরে বাসায় ফিরছিল রিও। কদিন ধরেই স্ত্রীর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম আশা করছে ও। মনে মনে ভাবছে টেলিগ্রামটা আসল কিনা। সবাই আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছে, এ অনুভূতিটা তখন ওর ভেতরও জেগে উঠেছে।

দারোয়ানের ঘর পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ও। বুড়ো

মিশেল-এর জায়গায় নতুন যে দারোয়ানটা এসেছে সে তখন জানালায় মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে একটু হাসল লোকটা। সিঁড়ি বেয়ে ওপর পানে রওনা হলো রিও। চোখের সামনে ভাসছে দারোয়ানের হাসি হাসি মুখখানা।

ফ্ল্যাটের বাইরের দরজা খোলার সময় রিও দেখল মা হলঘর পেরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে বললেন, তারিউ অসুস্থ বোধ করছে। মাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো রিও-র। তাড়াতাড়ি বলল, 'খুব সম্ভব এটা মারাত্মক কিছু নয়।'

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে তারিউ। বালিশের মধ্যে ডুবে গেছে মাথা। চাদরের নিচে ওর প্রশস্ত বুকটা বেশ উঁচু দেখাচ্ছে। একটু পর পর বাড়ছে জ্বর, সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। 'লক্ষণগুলো তেমন সুস্পষ্ট নয়। তবে প্লেগ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই,' রিওকে বলল তারিউ।

ওর শরীর পরীক্ষা করে রিও বলল, 'না। তেমন সুস্পষ্ট কোন লক্ষণ এখনও দেখছি না।'

কিন্তু ঘন ঘন প্রচণ্ড পিপাসা পাচ্ছিল তারিউ-এর। ঘরের বাইরে এসে রিও ওর মাকে বলল, 'মনে হচ্ছে ওর প্লেগই হয়েছে।'

'বলিস কী,' আঁতকে উঠলেন মা। 'তা কী করে সম্ভব, অন্তত এখন?' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'বার্নার্ড, আমার মনে হয়, ওকে আমাদের কাছে রাখাই ভাল।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রিও। 'মা, সবকিছু মেনে চললে ওকে আমরা বাসায় রাখতে পারি না। তবে কয়েক দিন পরেই শহরের ফটক খুলে দেয়া হবে, সে সময় তুমি যদি শহরের বাইরে চলে যাও, তাহলে আমি তারিউ-এর দায়িত্ব নিতে পারি।'

'বার্নার্ড, আমার কথা শোনো। তারিউও থাকুক, আমিও থাকি। এই তো সেদিন আমি টিকা নিলাম।'

রিও মাকে বুঝিয়ে বলল, 'মা, তারিউও টিকা নিয়েছিল। তবে এমন হতে পারে শেষবারের টিকা নিতে হয়তো ও ভুলে গেছে, কিংবা অন্যান্য ব্যাপারেও সাবধান ছিল না।'

কথা বলতে বলতে রিও ওর সার্জারি রুমের দিকে এগিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, তারিউ দেখল ওর হাতে সিরামের বাক্স।

'আচ্ছা, এতক্ষণে বুঝলাম। তাহলে আমাকে প্লেগই ধরেছে,' বলল তারিউ।

'তা নাও হতে পারে। তবে কোনরকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না, তাই।'

কোন কথা না বলে টিকা নেয়ার জন্যে ওর একটা হাত রিও-র দিকে বাড়িয়ে দিল তারিউ। এই টিকা ও নিজেও বহু লোককে দিয়েছে। অনেক সময় লাগে।

'সন্ধ্যার দিকে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী?' ওর চোখের দিকে তাকাল রিও।

'কিন্তু আমাকে আলাদা রাখার কী ব্যবস্থা করছ?'

'এখনই সে প্রশ্ন উঠছে না। তোমার প্লেগ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

কষ্টের হাসি হাসল তারিউ। 'রিও, বোধ হয় এই প্রথম কোন রোগীকে আলাদা না করে তুমি টিকা দিলে।'

ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল রিও। 'দেখো, তুমি এখানে থাকলে তোমার দেখাশোনাটা ভাল হবে। মা এবং আমি দুজনেই তোমার পাশে থাকতে পারব।'

কোন তর্ক করল না তারিউ। সিরামের বাক্স গুছিয়ে নিল রিও।

তখনও মুখ ফিরিয়ে আছে ও। আশা করছে কিছু বলবে তারিউ। কিন্তু কোন সাড়া দিল না সে। ওর বিছানার পাশে এল রিও। তারিউ-এর চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে ওর দিকে। চেহারা মলিন হলেও, ধূসর চোখগুলো তখনও শান্ত।

রিও হাসল। 'তারিউ, ঘুমোনোর চেষ্টা করো। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।' কথাগুলো বলেই কয়েক পা এগিয়ে গেল ও। এমন সময় শুনতে পেল তারিউ ওকে ডাকছে। আবার ফিরে এল রিও। তারিউ-এর ভাবভঙ্গি ওর কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকল। রিও দেখল, তারিউ কিছু একটা বলার জন্যে নিজের ভেতর প্রচণ্ড তাড়না অনুভব করছে, অথচ কিছুতেই সে কথা বলতে চাচ্ছে না।

'রিও,' মুখ খুলল তারিউ, 'আশা করি তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলবে। এটুকু নিশ্চয় তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি।'

'হ্যাঁ, তারিউ। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

স্বাভাবিক হয়ে এল তারিউ-এর গম্ভীর মুখটা। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, রিও। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি আমার মৃত্যু কামনা করছি না। মৃত্যুকে বাধা দেবার জন্যে আমি আমার সাধ্যমত সব চেষ্টা করে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি হেরেই যাই; তাহলে আমার একটাই বাসনা, আমার মৃত্যুটা যেন ভালভাবে হয়।'

তারিউ-এর ওপর ঝুঁকে ওর কাঁধে একটু চাপ দিল রিও। 'না, না, মৃত্যু নয়, তারিউ। তুমি যেন মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারো, সে জন্যে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। তারিউ, সংগ্রাম করে যাও।'

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে গায়ে ওভারকোট নিয়েই তারিউ-এর ঘরে

ঢুকল রিও। ওর অবস্থা আগের মতই। জ্বরের প্রকোপে ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'কেমন আছ, তারিউ?' জানতে চাইল রিও।

চাদরে ঢাকা কাঁধ দুটো একটু উঁচু করল তারিউ। 'মনে হয় সংগ্রামে হেরে যাচ্ছি।'

ওর ওপর ঝুঁকে পড়ল রিও। শরীরের অনেক জায়গায় গ্রন্থিস্ফীতি দেখা যাচ্ছে। বুকের ভেতর একটা ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। দু-ধরনের প্লেগের লক্ষণই ফুটে উঠেছে ওর শরীরে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রিও। বলল, 'সিরামের কাজ এখনও শুরু হয়নি।' কী যেন বলতে চাচ্ছিল তারিউ। কিন্তু জ্বরের ঘোরে কিছুই বলতে পারল না।

রাতের খাওয়ার পর রিও এবং মা রোগীর পাশে এসে বসলেন। রিও ইনজেকশনের সাহায্যে উত্তেজক কিছু ঔষধ তারিউ-এর শরীরে ঢুকিয়ে ওর ফোঁড়াগুলোকে খুব দ্রুত ফাটিয়ে দিতে চাইছিল, যদিও এতদিনের ব্যর্থ অভিজ্ঞতার ফলে ও জানে এগুলোর কার্যকারিতা কতটুকু।

সারা রাত ধরে একটার পর একটা প্লেগের আক্রমণ প্রতিহত করল তারিউ। একবারও ওর ভেতর কোন চঞ্চলতা বা উদ্বেগ দেখা গেল না। কথা বলারও চেষ্টা করল না। অত বড় শরীরটায় বোধশক্তি বলতে কিছুই নেই তখন। আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে কখনও কখনও হেরে যাচ্ছে ও। রিও সেটা বুঝতে পারছে ওর চোখ দেখে। কখনও কখনও চোখাচোখি হচ্ছে ওদের দুজনের সঙ্গে। সে সময় জোর করে হাসছে তারিউ।

হঠাৎ আরম্ভ হলো প্রবল বর্ষণ, আর সেই সাথে শিল পড়া। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছে রিও। সেটা কেটে যেতেই অন্ধকারের এপার থেকে চোখ দুটোকে মেলে ধরছে তারিউ-এর

ওপর। মা ওর পাশে বসে কী যেন একটা বুনছেন, আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন ওর দিকে। বৃষ্টি থেমে যাবার পর ঘরের ভেতর আরও বেড়ে গেল নীরবতা। রিও অনুভব করল, উত্তেজনায় দপদপ করছে ওর সমস্ত স্নায়ু। ইশারায় মাকে বিছানায় যেতে বলল ও। মা নীরবে মাথা নাড়লেন, তাঁর চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গভীর মনোযোগ দিয়ে ছুঁচের ডগাটা দেখতে লাগলেন তিনি। উঠে তারিউ-এর মুখে একটু পানি দিল রিও, তারপর আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।

তখন ভোর হয়-হয়। রিও মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'মা, তুমি যাও। এবার একটু বিশ্রাম নাও। সকাল আটটায় তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে। তখন আমি থাকব না। আর শোনো, শোয়ার আগে চোখে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিতে ভুলে যেয়ো না।'

উঠলেন মাদাম রিও। হাতের জিনিসগুলো গুছিয়ে তারিউ-এর বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ হলো চোখ বন্ধ করে আছে তারিউ। কুঁচকে গেছে কপাল, ঘামে জট পাকানো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এর চারপাশে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাদাম রিও। চোখ মেলে তাকে দেখল তারিউ। দেখল, শান্ত স্নেহভরা সেই মাতৃমুখ ঝুঁকে আছে ওর ওপর। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটল ওর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো আবার বন্ধ হয়ে গেল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মা-র ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটাতে বসল রিও।

ঝিমুচ্ছিল রিও। রাস্তার গাড়ির শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। শিরশির করে উঠল ওর শরীর। সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল তারিউ-এর দিকে। চেহারায় একটা অবসাদের ভাব ফিরে এসেছে ওর। মনে হলো ঘুমুচ্ছে। ওর পাশে দাঁড়াল রিও। তখনই একটা শূন্য দৃষ্টি নিয়ে

ওর দিকে তাকাল তারিউ। তখনও ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি।

'ঘুমুচ্ছিলে, না?' কথা বলল রিও।

'হ্যাঁ, হয়তো।'

'শ্বাস নিতে এখনও কষ্ট হচ্ছে?'

'একটু একটু। এ থেকে কিছু অনুমান করতে পারবে?'

'না, তারিউ। তুমি তো জানো সকালের দিকে বেগ একটু কমে আসে।'

'ধন্যবাদ। সত্যিকারের অবস্থা কখন কী রকম থাকে আমাকে সবসময় তা জানতে দেবে, এ আশাটুকু আমি তোমার কাছ থেকে করতে পারি নিশ্চয়।'

ওর বিছানায় বসল রিও। তারিউ-এর পা দুটোকে মনে হলো লাশের পা-র মত শক্ত। ফের শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হলো তারিউ-এর।

'আবার জ্বর উঠবে, তাই না, রিও?'

'হয়তো। দুপুরের দিকে বুঝতে পারব সত্যিকারের অবস্থা কী।'

চোখ বন্ধ করল তারিউ। মনে হলো নিজের ভেতর শক্তি সঞ্চয় করতে চাইছে। যখন চোখ খুলল তখন দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে ওর। তখন রিও একটা গ্লাস হাতে ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা দেখে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর।

'এটা খাও।'

গ্লাসের পানি খেয়ে ফেলল তারিউ। আস্তে আস্তে আবার মাথাটা রাখল বালিশের ওপর। 'আমার বেলায় অনেক সময় নিচ্ছে, তাই না, রিও,' অস্ফুটভাবে বলল ও।

ওর একটা হাত জড়িয়ে ধরল রিও। বন্যার দুর্বার স্রোতের মত

জ্বর উঠছে। লাল হয়ে উঠল দুই গাল, কপাল। ওর দিকে চোখ ফেরাল তারিউ। ঝুঁকে পড়ে রিও ওকে উৎসাহ দিল। হাসার চেষ্টা করল ও। কিন্তু মুখ শুকিয়ে যাওয়ায় চোয়াল আর ঠোঁট আটকে গেল, হাসি বেরুল না। শুধু চোখ দুটোকে তখনও মনে হচ্ছে জীবন্ত, সাহসে ভরা।

সকাল সাতটার দিকে এলেন মাদাম রিও। রিও ওর সার্জারি রুমে গিয়ে টেলিফোন করল হাসপাতালে। ওর জায়গায় অন্য একজন ডাক্তারের ডিউটির ব্যবস্থা করল, প্রতিদিন সকালে ডাক্তারদের সঙ্গে যে পরামর্শ হত সেটাও বাতিল করে দিল ও। এরপর খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার তারিউ-এর ঘরে ঢুকল ও। বিছানার পাশেই বসে আছেন মাদাম রিও। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তারিউ। হঠাৎ বিস্ফারিত হলো ওর দৃষ্টি। সেটা দেখে নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চেয়ার থেকে উঠে বিছানার পাশের বাতিটা নিভিয়ে দিলেন মাদাম রিও। একটা হাত রাখলেন ওর ঘামে ভেজা জট পাকানো চুলে। অনেক দূর থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল তাঁর কানে, 'ধন্যবাদ। এখন মোটামুটি ভাল লাগছে।' আবার চেয়ারে এসে বসলেন মাদাম রিও। তখন দেখতে পেলেন, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে তারিউ। ওর মুখটাও বন্ধ হয়ে আছে। বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা। তবু একটা কোমল হাসি খেলা করছে মুখের চারপাশে।

দুপুরে জ্বর বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল। রক্ত উঠে এল থুতুর সাথে। কাশির ফাঁকে ফাঁকে ও তখনও ওদের দিকে তাকাচ্ছে। আস্তে আস্তে কমে এল ওর চোখ খোলার পালা। বিধ্বস্ত চেহারায় যে উজ্জ্বল আভাটা ফুটে উঠছিল সেটাও ম্লান হয়ে এল ক্রমশ। মারা গেল তারিউ। তার আগে কখন ও দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছে, কখন একটা আর্তনাদ করে নিজেকে সঁপে দিয়েছে মৃত্যুর হাতে, রিও সেসবের কিছুই লক্ষ করেনি। দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এল ওর। সে অশ্রু অসহায় ক্রোধের।

রাতে মা ও ছেলে লাশ পাহারা দিতে বসল। মাঝে মাঝে স্ত্রীর কথা মনে পড়তে চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে রিও-র। থেকে থেকে ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন মাদাম রিও। চোখাচোখি হতেই হাসছে রিও।

'বার্নার্ড?'

'বলো, মা।'

'খুব ক্লান্তি লাগছে?'

'না, মা।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন মাদাম রিও। মা-র দিকে তাকিয়ে হাসল রিও। তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল, সত্যিই ও ক্লান্ত বোধ করছে না। ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, 'এবার দূরে পাহাড়ী কোন স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে তোর কিছুদিন বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, মা। তাই করব এবার।'

পরের দিন সকালে নিজের সার্জারিতে কাজ করছিল রিও, ছুটতে ছুটতে ভেতরে ঢুকে ওকে একটা টেলিগ্রাম দিলেন মাদাম রিও। এরপর, যে ছেলেটা টেলিগ্রাম এনে দিয়েছে তাকে বকশিশ দেয়ার জন্যে ফিরে গেলেন তিনি।

ফিরে এসে তিনি দেখলেন, খোলা টেলিগ্রাম হাতে বসে আছে রিও। তাঁকে দেখে জানালার বাইরে চোখ মেলে দিল ও।

'বার্নার্ড।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মা-র দিকে তাকাল রিও। তাঁর মনে হলো একজন অপরিচিত মানুষকে দেখছেন তিনি।

'খবর কী?'

'ওহ্। হ্যাঁ, সেই একই খবর। এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে ও।' মাদাম রিও নিজেও জানালার দিকে মুখ ফেরালেন। মাকে কাঁদতে বারণ করল রিও। গত কয়েকমাস হলো, বিশেষ করে গত দুদিন থেকে এই দুঃখের ব্যথা সইতে হচ্ছে ওকে।

চার

ফেব্রুয়ারির এক ঝলমলে সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়া হলো শহরের সবগুলো ফটক। সেদিন উৎসবের আয়োজন করা হলো শহরে। স্টেশনে, ইঞ্জিন থেকে উঠল ধোঁয়া; জাহাজ এসে পৌঁছল বন্দরে। যারা ফিরছে তাদের হৃদয় কাঁপছে অজানা আশঙ্কায়। শহরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তারা তখনও কিছুই জানে না। মনে মনে এক বিভীষিকার চিত্র কল্পনা করে রেখেছে সবাই। বিচ্ছেদের দিনগুলোতে তাদের সময় কিছুতেই কাটতে চাইত না, তখন কামনা করত দ্রুত পার হয়ে যাক সময়। আজ শহরের কাছাকাছি পৌঁছে তারা চাইছে সময়ের গতি আরও মন্থর হোক। ওদিকে, যারা বাসায় কিংবা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিল, তারা ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে পড়ল; আশঙ্কায় কাঁপতে শুরু করল বুক। র‍্যাবেয়াও এসেছে স্টেশনে। প্রথম ট্রেনেই আসছে ওর প্রেমিকা। ও নিজেও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, ওর-ও বুক

কাঁপছিল।

কিন্তু ইঞ্জিনের ধোঁয়া চোখে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে একটা দুর্বার উন্মত্ত আনন্দে ভরে উঠল সবার মন। ট্রেন স্টেশনে এসে থামতেই শত শত হাত দীর্ঘদিনের বঞ্চিত অধিকারে ফিরে পাবার ব্যাকুল আগ্রহে এমন সব শরীরকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে গেল সময়ের ব্যবধানে যাদের চেহারাও ওদের মনে নেই। র‍্যাঁবেয়ার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটল। যে রমণী ওর দিকে ছুটে এল, তার শরীরের দিকে একবার ভাল করে তাকাবারও সুযোগ হলো না ওর, তার আগেই ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর প্রেমিকা।

দু'হাতে প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরল র‍্যাঁবেয়া। মাথাটা চেপে ধরল কাঁধের ওপর। পরিচিত চুলগুলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। এরপর ওর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অবরুদ্ধ অশ্রু। কিন্তু বুঝতে পারল না এই অশ্রু সেই মুহূর্তের আনন্দের, নাকি দীর্ঘদিনের চাপা দুঃখের। পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে নিজের নিজের বাসার দিকে ফিরে চলল মানুষ। কিন্তু সবার ভাগ্যেই এই ঘটনা ঘটল না। কিছু কিছু লোক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখল তাদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই।

রাস্তায়, পার্কে নাচতে শুরু করল মানুষ। রাস্তা ভরে গেল গাড়িতে গাড়িতে। সারাটা বিকেল ধরে গির্জার ঘণ্টা বেজে চলল পুরোদমে। ভরে উঠল আনন্দ ফুর্তির আড্ডাগুলো। প্রতিটা কাফেয় বের করা হলো মদের শেষ বোতলটাও। প্রত্যেক পান্থশালার সামনে উন্মত্ত হয়ে উঠল মাতাল জনতা; তাদের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকাও আছে, সবার চোখের সামনে পরস্পরকে আদর করছে ওরা, কে কী ভাবছে সেটা খেয়াল করেও দেখছে না কেউ।

গির্জার ঘণ্টা, বন্দুকের গর্জন, বাজনার সুমধুর ছন্দ, কানে তালা লাগানো বহু কণ্ঠের চিৎকার ইত্যাদির মিলিত গর্জনের ভেতর দিয়ে সেদিন পড়ন্ত বেলায় সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় শহরের উপকণ্ঠের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল রিও। আলোকিত হয়ে উঠেছে শহর, ভেসে আসছে কাবাব আর মদের গন্ধ। ওর চারপাশে উৎফুল্ল জনতা তাকিয়ে দেখছে উজ্জ্বল আকাশ। আলিঙ্গনরত নারীপুরুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে কামনার অস্ফুট শীৎকার।

হেঁটে চলল রিও। যতই সামনে এগোচ্ছে ততই বাড়ছে ভিড়। আর সেই সাথে শোরগোল। ওর মনে হলো গন্তব্য ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এ সময় বিচিত্র এক অনুভূতি জেগে উঠল ওর ভেতর। ওই কলকণ্ঠ উন্মত্ত জনতার মাঝে মিশে যাবার একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করল ও।

গ্রাঁদ এবং কটার্ড যেখানে থাকে সে রাস্তাটার মোড় ঘুরতেই রিও উপলব্ধি করল যাদের কামনা ব্যক্তি-মানুষ আর তার ভালবাসাকে পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সবসময়ের জন্যে না হলেও মাঝে মাঝে তাদের সেই বাসনা পূরণ হওয়া উচিত।

পাঁচ

গ্রাঁদ এবং কটার্ড-এর বাসায় যাওয়ার রাস্তাটায় ঢুকতেই রিও দেখল পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে একদল পুলিস। দূর থেকে ভেসে আসছে আনন্দ ফুর্তির উল্লাসধ্বনি। সে কারণে এই শান্ত অঞ্চলটাকে আরও শান্ত মনে হচ্ছে।

'মাফ করবেন, ডাক্তার সাহেব,' বলল একজন পুলিস, 'আপনাকে ওদিকে যেতে দিতে পারব না। একজন পাগল বন্দুক নিয়ে যাকে দেখছে তাকেই গুলি করছে। আপনি এখানেই থাকুন। আপনার সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

রিও দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে গ্রাঁদ। কী ঘটেছে সে সম্পর্কে গ্রাঁদ কিছুই জানে না। পুলিস ওকেও সামনে যেতে দেয়নি। ওরা ওকে জানিয়েছে গুলি ওর বাসার দিক থেকেই আসছে।

সামনে যে পুলিসের দল ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের থেকে কিছু দূরে আর একদল পুলিস ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনের রাস্তাটা নির্জন। জনশূন্য মোড়ের ওপর পড়ে আছে একটা টুপি আর এক টুকরো নোংরা ছেঁড়া কাপড়। রিভলভার হাতে বাড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বেশ কিছু পুলিস। তিনতলার একটা জানালা ছাড়া বাড়ির অন্যান্য জানালা বন্ধ।

মনে হচ্ছে জানালার পাল্লাটা আলগাভাবে ঝুলছে একটা কব্জার ওপর।

হঠাৎ ওরা শুনতে পেল দুটো রিভলভারের আওয়াজ। গ্রাঁদ-এর বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়িটা থেকে ভেসে এল সেই শব্দ। তিন তলার সেই জানালাটা থেকে ছিটকে পড়ল কয়েকটা টুকরো। আবার নীরব হয়ে গেল চারদিক। সারা দিনের উৎসবের পর রিও-র কাছে ব্যাপারটা মনে হলো অবাস্তব।

'আরে, ওটা তো কটার্ড-এর জানালা,' চিৎকার করে উঠল গ্রাঁদ।

'আপনারা ওভাবে গুলি করছেন কেন?' সামনের পুলিসটাকে জিজ্ঞেস করল রিও।

'লোকটাকে ব্যস্ত রাখছি। আমরা একটা পুলিসের গাড়ি আসার অপেক্ষা করছি। বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেখলেই গুলি করছে পাগল লোকটা। কিছুক্ষণ আগে একজন পুলিসকে জখম করেছে ও।'

'কিন্তু ওর এভাবে গুলি করার কারণ কী?'

'আমারও প্রশ্ন ওটাই। রাস্তার ওপর কিছু লোক আনন্দ ফুর্তি করছিল, এমন সময় ছাদ থেকে কে একজন ওদের দিকে গুলি ছোঁড়ে। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি ওরা। কিছুক্ষণ পর আবার গুলি হয়, তখন চিৎকার করতে করতে ওরা এদিক ওদিক ছুটতে থাকে; ওদের ভেতর আহত হয় একজন, অন্যরা পালিয়ে যায়। মনে হয় লোকটার মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।'

রাস্তায় একটা কুকুর বেরিয়ে এল। একটা রোগা স্প্যানিয়েল। কয়েক মাস পর এই প্রথম কুকুর দেখল রিও। হয়তো ওর মনিব এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল ওকে। দেয়ালের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে পা ফেলে কটার্ড-এর বাড়ির দরজার সামনে থামল সারমেয় জন্তুটা।

তারপর রাস্তার ওপর বসে পড়ে মাছি তাড়াতে লাগল। পুলিসদের কয়েকজন শিস দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল ওটাকে। মাথা তুলল কুকুরটা, এগিয়ে গেল সামনের রাস্তার ওপর, বার কয়েক শুঁকল পড়ে থাকা টুপিটা। এমন সময় তিনতলার সেই জানালাটা থেকে রিভলভারের গুলি এসে বিঁধল ওর গায়ে। শূন্যে একটা ডিগবাজি খেলো কুকুরটা, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে। রিও-র পিছনে ব্রেক কষার শব্দ হলো, থামল একটা গাড়ি।

'এই যে এসে পড়েছে,' বলল একজন পুলিস।

গাড়ির ভেতর থেকে রাস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন পুলিস অফিসার। গাড়ি থেকে নামাল দড়ি, মই, দুটি মোড়ক। ঢুকে পড়ল বিপরীত দিকের বাড়িঘরের পিছনের একটা গলিতে। তখন থেমে গেছে কুকুরটার নড়াচড়া। চক্‌চক্‌ করছে চারপাশে জমা কালো রক্ত।

অকস্মাৎ উল্টো দিকের একটা বাড়ির জানালা থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি। তিনতলার সেই জানালাটা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল। দেয়ালে তৈরি হলো মস্ত বড় এক ফাঁক। অন্য একটা বাড়ি থেকে গুলি ঢুকল ওই ফাঁকটায়। ফুটপাথের ওপর ভেঙে পড়ল ইট, চুন, সুরকি। তিনজন পুলিস অফিসার গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢুকে পড়ল কটার্ড-এর বাড়ির দরজায়। বাড়ির ভেতর দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হলো। তারপর শুরু হলো ছোটাছুটি। কিছুক্ষণ পর দরজায় দেখা গেল ছোটখাট একটা লোক প্রাণপণে চিৎকার করছে, আর পুলিস তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে আনার চেষ্টা করছে।

একসঙ্গে খুলে গেল আশেপাশের বাড়িঘরের সমস্ত জানালা। প্রত্যেক জানালায় দেখা দিল উৎসুক মুখ। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে

এল লোকজন। রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বামন লোকটাকে। দুই হাত পিঠ মোড়া করে ধরে রেখেছে দুইজন পুলিস অফিসার। অনবরত চিৎকার করছে লোকটা। একজন পুলিস এগিয়ে এসে বিরাশি সিক্কা ওজনের দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ওর চোয়ালে।

'ও তো কটার্ড,' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল গ্রাঁদ। 'কটার্ড শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল।'

রাস্তার ওপর চিত হয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল কটার্ড। সজোরে লাথি মারল একজন পুলিস। ভিড় ঠেলে ওর দিকে এগিয়ে গেল জনতার একটা ক্ষুদ্র অংশ। 'সরে দাঁড়ান,' গর্জে উঠল পুলিসের লোকটা।

একে একে রিও-র পাশ দিয়ে চলে গেল কটার্ড, পুলিস, জনতা। চোখ ফিরিয়ে রাখল ও।

অবশেষে হাঁটতে আরম্ভ করল রিও। তখন রাত নামছে। এই অঞ্চলটা বরাবর নির্জন থাকে। কিন্তু কটার্ড-এর ঘটনার পর রাস্তায় ভিড় জমে উঠেছে। বাসার দরজায় পৌঁছে ওকে শুভরাত্রি জানাল গ্রাঁদ। বলল, 'এখন থেকে আবার সন্ধ্যার কাজ শুরু করব।' এরপর সিঁড়িতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল ও। বলল, 'জেনিকে চিঠি লিখেছি। মনটা এখন আগের চেয়ে অনেক হালকা লাগে। সেই কথাটা আবার নতুন করে লেখায় হাত দিয়েছি। এবার বিশেষণগুলো রাখব না।' চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। মাথা থেকে টুপি খুলে ধীরে ধীরে অভিবাদনের ভঙ্গিতে নামিয়ে আনল টুপিসুদ্ধ হাতটা। হাঁপানি রোগীর বাসার দিকে পা বাড়াল রিও। বুড়ো তখন তার অভ্যাসমত এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে গুনে গুনে রাখছে মটর দানা।

'এখন এই যে সবাই আনন্দ ফুর্তি করছে, মনে হয় ঠিকই

করছে ওরা,' বলল বুড়ো। তারপর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, তারিউ-এর খবর কী?'

'মারা গেছে।' মনোযোগ দিয়ে বুড়োর বুকের ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে লাগল রিও।

'সত্যি?' বেশ বিব্রত বোধ করল হাঁপানি বুড়ো।

'হ্যাঁ। প্লেগে।'

এক মিনিট নীরব থাকার পর বুড়ো বলল, 'পৃথিবীতে দেখি যারা ভাল মানুষ তারাই তাড়াতাড়ি মারা যায়। খুব কাজের মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক।'

'হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন?' স্টেথোটা গুছিয়ে নিল রিও।

'বাজে কথা পছন্দ করতেন না একদম। আমার খুব ভাল লেগেছিল তাকে। লোকে এখন বলাবলি করছে শহরে প্লেগ এসেছিল। এমন ভাব করছে যেন এজন্যে ওদের মেডেল পাওয়া উচিত। কিন্তু আমার কথা, প্লেগ জিনিসটা আসলে কী জীবনেরই একটা অংশ–এর বেশি কিছু নয়।'

'ফুসফুসের যে ওষুধটা দিয়েছি সেটা নিয়মিত টানবেন।'

'ডাক্তার সাহেব, আমাকে নিয়ে অত চিন্তা করবেন না। কিভাবে বাঁচতে হয়, আমি জানি।'

ঘর থেকে বেরুবার সময় হঠাৎ মাঝপথে থমকে দাঁড়াল রিও। বলল, 'আপনার ছাদে একটু যেতে চাই, কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়।'

'অবশ্যই না। আচ্ছা, শুনছি যারা প্লেগে মারা গেছে তাদের জন্যে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হবে। সত্যি?'

'কাগজে তো তাই লিখেছে।'

'এমন কিছু একটা হবে সেটা আমি আগেই জানতাম। নিশ্চয়

সেখানে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থাও হবে? বক্তৃতায় কী বলা হবে সেটা আমি এখনই শুনতে পাচ্ছি: আমাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর···। তারপর যে যার ঘরে ফিরে আরাম করে খাবে-দাবে, তাই না?'

রিও তখন সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক পথ উপরে উঠেছে। মাথার ওপর ঝলমল করছে শান্ত সুদূর আকাশ। দূরে পাহাড়ের ওপর ছিটকে পড়ছে নক্ষত্রের আলো। প্লেগের কথা ভুলে থাকার জন্যে সেদিন রাতে ছাদে উঠে যেমন দেখেছিল আজকের রাতেও চারপাশের পরিবেশটা তেমনি। কেবল আজ রাতে সমুদ্রের ঢেউগুলো আরও প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে। আবহাওয়া আরও স্বচ্ছ, শান্ত। বাতাসে নেই সমুদ্রের সেই লোনা গন্ধ। শহরে কোলাহল উপলসৈকতে আছড়ে'পড়া ঢেউয়ের মত শোনা যাচ্ছে এখনও, তবে আজ রাতে বিদ্রোহের কথা বলছে না ওগুলো, বলছে মুক্তির কথা। দূর-আকাশে, মূল শহরের মাথার ওপর ঝুলে আছে লাল একটা আভা। আজকের এই সদ্যোজাত স্বাধীনতার রাতে আকাঙ্ক্ষা বাধা মানছে না কোন, আর এরই নিনাদ পৌঁছুল রিও-র কানে।

রাতে, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ আতসবাজি পোড়ানোর আয়োজন করেছিলেন। অন্ধকার বন্দর থেকে তারই প্রথম ফানুস নিক্ষেপ করা হলো আকাশে। শহরবাসীরা উল্লাসের ভেতর দিয়ে স্বাগত জানাল তাকে।

চারদিক থেকে তুমুল হর্ষধ্বনির এক একটা বিরাট তরঙ্গ উত্তাল উর্মিমালার মত ছুটে এসে আঘাত করছে ছাদে, বারান্দায়, দেয়ালে। গর্জে ফুলে ফুলে উঠছে সেই ঢেউ। বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে ওগুলোর আকার। আর উঁচু পর্বতের শীর্ষ থেকে উজ্জ্বল আলো জলপ্রপাতের মত অজস্র ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে শূন্য

অন্ধকারের ভেতর।

দূর শহর থেকে ভেসে আসা তুমুল হর্ষধ্বনি শুনতে শুনতে রিও ভাবল, মানুষের এই বিজয় উল্লাস যে-কোন দিন আবার হয়তো বিপন্ন হবে। সেটাই হয়তো নিয়ম। কেননা প্লেগের জীবাণু কখনোই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, অদৃশ্যও হয় না চিরতরে; বছরের পর বছর এই জীবাণু সুপ্ত থাকে আসবাবপত্রের মাঝে, কাপড়চোপড়ের বাক্সের ভেতর; ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করে শোবার ঘরে, ভাঁড়ারে, বড় বড় ট্রাংক, বইয়ের শেলফে; তারপর সেই দিনটি আসে যেদিন এই জীবাণু মানুষের সর্বনাশ এবং শিক্ষার জন্যে আবার তার ইঁদুরগুলোকে জাগিয়ে উত্তেজিত করে মরবার জন্যে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরকে পাঠিয়ে দেয় আনন্দমুখর কোন শহরে।

***

বাংলাপিডিএফ.নেট ১৫.০৫.১২ ইং তারিখ থেকে বইয়ের মাঝে সকল প্রকার ওয়াটারমার্ক প্রয়োগ বন্ধ করেছে। যাতে করে পাঠকদের বই পড়তে আরকোন সমস্যা না হয়। কিন্তু এতে করে আমাদের প্রচারে বাধা আসবে। তাই সকল পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি হয়ত আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বাংলাপিডিএফ.নেট

যেই বই চোরারা আমাদের বই চুরি করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে তাদের আসল বাবা অথবা মা কে, তারা মনে হয় সেটা জানে না। অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয় জা** । এরা চাইলে নিজের মা কেও বিক্রি করে দিতে পারে যে কোন সময়। তাদেরকে বলি এই চুরি বন্ধ কর। নাহলে লোকে তোদের সাথে তোদের বাবা মাকেও গালি দিবে। জানি এই কথা তোরা কানে নিবি না, কিন্তু তাহলে নিজেকে সত্যিকারের জা** হিসাবে প্রমাণ করবি।